মৌলিক অধিকার(Fundamental Rights)

মৌলিক অধিকার কি তা বুঝতে গেলে আমাদের প্রথমে অধিকার বলতে রাষ্ট্র দার্শনিকগণ কি বলেছেন তা জানতে হবে। অধ্যাপক আর্নেস্ট বার্কার (Ernest Barker) অধিকার প্রসঙ্গে বলেন, ‘অধিকার হল সকল মানুষের সম্ভাব্য সর্বাধিক পরিমাণ ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী সেই সকল প্রয়োজনীয় শর্ত যেগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হয়’। অধ্যাপক হ্যারল্ড ল্যাস্কির(Harold Laski) মতে, অধিকার বলতে, ‘সমাজ জীবনের সেই সকল শর্তকে বোঝায় যেগুলি ছাড়া সাধারণভাবে ব্যক্তির সর্বধিক বিকাশ সাধিত হতে পারে না। উপরোক্ত দুটি সংজ্ঞা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, কোনো সুযোগ-সুবিধা বা দাবিকে তখনই অধিকার বলা যাবে যদি সেই দাবিটি দুটি শর্ত পূরণ করে - ১) তা প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক হবে এবং ২) রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হবে।

সাধারণতঃ মৌলিক অধিকার বলতে কি বোঝায় তা এককথায় বলা যথেষ্ট কঠিন ব্যাপার। সাধারণভাবে বলা যায়, নাগরিক অধিকারসমূহের মধ্যে যেগুলি ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়, সেগুলিকে মৌলিক অধিকার বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এম. এম. সিং-এর মতে, প্রকৃতিক অধিকারের মধ্যে যেসকল অধিকারের উৎস নিহিত থাকে, সেগুলিকে মৌলিক অধিকার বলে বর্ণনা করা যায়। অন্যান্য অধিকারের ওপর শ্রেষ্ঠত্বের জন্য এই সকল অধিকারকে মৌলিক অধিকার বলা হয়। এ. কে. গোপালন বনাম মাদ্রাজ রাজ্য মামলায়(১৯৫০) রায় দিতে গিয়ে বিচারপতি পতঞ্জলি শাস্ত্রী এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে, ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অংশে বর্ণিত 'মৌলিক অধিকারগুলি হল মৌলিক'। কারণ, চরম সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী হিসাবে জনগণ তাদের নিজেদের জন্য এগুলিকে নিজেদের হাতে রেখে দিয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের কর্তৃত্বের বাইরে এই সকল অধিকার রয়েছে বলে এগুলিকে মৌলিক অধিকার বলা হয়।

এর অর্থ হল - মৌলিক অধিকার হল সেই সকল অধিকার, যেগুলি রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপের ওপর সীমাবদ্ধতা বা বাধানিষেধ আরোপ করতে সক্ষম। এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বিচারপতি পতঞ্জলি শাস্ত্রী বলেছিলেন যে, সংবিধানের তৃতীয় অংশের সামগ্রিক লক্ষ্য হল- ওই অংশে বর্ণিত স্বাধীনতা ও অধিকার সমূহকে রাষ্ট্রের স্বৈরাচারী হস্তক্ষেপ থেকে সংরক্ষণ করা। ভারতে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানও মন্তব্য করেছিলেন যে, মৌলিক অধিকারগুলিকে রাষ্ট্রের ওপর আরোপিত বাধ্যবাধকতা হিসাবেই গড়ে তোলা হয়েছে। এখানে রাষ্ট্র বলতে শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগকে বুঝতে হবে।

মৌলিক অধিকারে প্রকৃতি ঃ

১৯৫০ সালে এ. কে. গোপালন বনাম মাদ্রাজ রাজ্য মামলায় মহামান্য সুপ্রিমকোর্ট ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অংশে বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলিকে ভারতের ‘মহাসনদ’ বা ‘ম্যাগনা কার্টা’ (Magna Carta) বলে বর্ণনা করেছিলেন। ইংলণ্ডের মহাসনদ(১২১৫), ‘অধিকারের আবেদনপত্র’(Petition of Rights), ‘অধিকারের বিল’(Bill of Rights), ভোটাধিকার সম্প্রসারণ সংক্রান্ত ‘সংস্কার আইনসমূহ’ (Reform Acts 1832, 1867, 1884-85); ফ্রান্সের ‘মানুষ ও নাগরিকদের অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা’(Declaration of the Rights of Man and Citizen, 1789) ‘মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকারের বিল’(The American Bill of Rights, 1791); ‘মানবাধিকার সংক্রান্ত বিশ্ব ঘোষণাপত্র’(Declaration of Human Rights, 1966) প্রভৃতি দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়ে ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতারা সংবিধানের তৃতীয় অংশে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহ লিপিবদ্ধ করেছিলেন। লক্ষণীয় বিষয় হল, বিশ্বের অন্য কোন দেশের সংবিধানে এত বিস্তারিতভাবে নাগরিকদের অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয় নি।

এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে সুভাষ কাশ্যপ তাঁর আওয়ার কনস্টিটিউশান (Our Constitution) নামক গ্রন্থে বলেছেন যে, ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অংশটি হল মানবাধিকার-সংক্রান্ত সর্বপেক্ষা বিস্তারিত সনদগুলির অন্যতম। আজ পর্যন্ত কোন রাষ্ট্রই এত বিস্তারিতভাবে তার সংবিধানের মধ্যে মানবাধিকার লিপিবদ্ধ করেনি। তাই বিচারপতি গজেন্দ্র গাদকার মৌলিক অধিকারগুলিকে ‘গণতান্ত্রিক জীবন ধারার যথার্থ ভিত্তি ও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অংশ’ বলে চিহ্নিত করেছেন। তবে লক্ষণীয় বিষয় হল, যুক্তরাজ্যের মতো ভারতে পার্লামেন্টের সার্বভৌমিকতা প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার ফলে মৌলিক অধিকারের ব্যাপারে সংবিধান কর্তৃক আরোপিত সীমাবদ্ধতা ও বাধা-নিষেধের গন্ডির মধ্যে থেকেই পার্লামেন্টকে কাজ করতে হয়। তাই মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী কিংবা মৌলিক অধিকার খর্বকারী কোন আইন পার্লমেন্ট কর্তৃক প্রণীত হলে সুপ্রিমকোর্ট বা হাইকোর্ট তা বাতিল করে দিতে পারে। কিন্তু ভারতীয় সুপ্রিমকোর্ট মার্কিন সুপ্রিমকোর্টের মতো অত্যধিক পরিমাণে শক্তিশালী না হওয়ার ফলে ৩৬৮ নং ধারা অনুসারে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে পার্লামেন্ট মৌলিক অধিকারে আস্তক্ষেপ করতে কিংবা সেগুলিকে খর্ব করতে সক্ষম।

উদাহরণ হিসাবে ২৫-তম ও ৪২-তম সংবিধান সংশোধনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সুতরাং বলা যায়, ভারতের পার্লামেন্টের সার্বভৌমিকতা এবং বিচার বিভাগীয় প্রাধান্যের মধ্যে সমঝোতা করার নীতি অনুসরণ করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এর ফলে মৌলিক অধিকারকে কেন্দ্র করে পার্লামেন্টের সাথে সুপ্রিমকোর্টের বিরোধ তীব্রতর আকার ধারণ করেছে। সুপ্রিমকোর্ট কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ মামলায় মৌলিক অধিকার সমূহের পবিত্রতা রক্ষার উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধনী আইনসমূহ কিংবা সেগুলির অংশকে সংবিধান বিরোধী বলে ঘোষণা করতে এবং সেই কারণে বাতিল করে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি। উদাহরণ হিসাবে গোলকনাথ বনাম পাঞ্জাব রাজ্য (১৯৬৭), কেশবানন্দ ভারতী বনাম কেরালা রাজ্য (১৯৭৩) ইত্যাদি মামলার রায়ের কথা কথা উল্লেখ করা যায়।

এখন মৌলিক অধিকারের সাথে অন্যান্য অধিকারের পার্থক্য বিশ্লেষণ করলে পূর্বে উক্ত অধিকারগুলির প্রকৃতি যথাযথভাবে উপলব্ধি করা যায়। এই সকল পার্থক্যের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যগুলি হল ঃ

১) দেশের সাধারণ আইন নাগরিকদের সাধারণ আইনগত অধিকারগুলিকে সংরক্ষণ করে। কিন্তু মৌলিক অধিকার সমূহ রাষ্ট্রের সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত ও রক্ষিত হয়।

২) মৌলিক অধিকারগুলি দেশের মৌলিক আইন অর্থাৎ সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হয় বলে আইন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত কোন আইন কিংবা শাসন বিভাগের কোন কাজ, নির্দেশ, আদেশ প্রভৃতি এগুলির বিরোধী হলে আদালত সেগুলিকে বাতিল করে দিতে পারে। এইভাবে আদালত মৌলিক অধিকারগুলির পবিত্রতা রক্ষা করে। কিন্তু আইনসভা কর্তৃক প্রণীত কোন আইন কিংবা শাসন বিভাগীয় কোন কাজ বা আদেশ, নির্দেশ প্রভৃতি সাধারণ অধিকারের বিরোধী হলেও আদালত সেগুলিকে বাতিল না-ও করতে পারে। কারণ সাধারণ অধিকারগুলি মৌলিক অধিকারের মতো পবিত্র বলে বিবেচিত হয় না।

৩) ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অংশে বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলিকে ‘মৌলিক’ বলা হয়। কারণ, সাধারণ আইন প্রনয়নের পদ্ধতি অনুসারে পার্লামেন্ট এগুলির পরিবর্তন সাধন করতে পারে না। সেজন্য সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন হয়। কিন্তু সাধারণ অধিকারের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য হয় না। অন্যভাবে বলা যায়, সংবিধান সংশোধন ছাড়াই সাধারণ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে পার্লামেন্ট সাধারণ অধিকারগুলির পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম।

৪) অনেক সময় আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্যতাকে সাধারণ অধিকার ও মৌলিক অধিকারের মধ্যে পার্থক্যের ভিত্তি বলে মনে করা হয়। বলা হয় যে, মৌলিক অধিকারগুলি আদালত কর্তৃক বিশেষভাবে বলবৎযোগ্য। তাই এরূপ অধিকার ভঙ্গ করা হলে আদালত তা সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কিন্তু সাধারণ অধিকারগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য নয়। কিন্তু এরূপ ধারণা সকল ক্ষেত্রে সত্য নয়। এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে দুর্গাদাস বসু তাঁর ইনট্রোডাকশন টু দ্য কনস্টিটিউশান অব ইন্ডিয়া নামক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অংশের বাইরে আদালত কর্তৃক 'বলবৎযোগ্য' কোন অধিকারের অস্তিত্ব নেই - একথা মনে করা ঠিক নয়। কারণ, সংবিধানের অন্যান্য ধারায় রাষ্ট্রের ওপর নানা ধরনের সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়েছে এবং এই সীমাবদ্ধতা কার্যত কিছু কিছু ব্যক্তিগত অধিকারে জন্ম দেয়।

শাসন বিভাগ বা আইন বিভাগ তাদের ওপর আরোপিত সীমাবদ্ধতা বা বাধানিষেধ উপেক্ষা করে কোন কাজ করলে যে-কোন ব্যক্তি আদালতের দ্বারস্থ্ হতে পারে এবং আদালতও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অধিকার রক্ষার জন্য এগিয়ে আসে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার বর্তমানে মৌলিক অধিকার বলে বিবেচিত না হলেও সেটিকে ‘একটি সাংবিধানিক অধিকার’ হিসাবে সুপ্রিমকোর্ট স্বীকৃতি প্রদান করেছে। সংবিধানের ৩০০-ক নং ধারা অনুসারে বেআইনিভাবে এই অধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত করা যায় না। তা করা হলে যে-কোন ব্যক্তি আদালতের শরণাপন্ন হতে পারে। তবে সুপ্রিমকোর্ট বা হাইকোর্ট মৌলিক অধিকারগুলিকে বলবৎ করার জন্য যেসব লেখ (Writs), আদেশ (Orders) বা নির্দেশ(Directions) জারি করতে পারে, অন্যান্য অধিকারের ক্ষেত্রে তা পারে না।

সংবিধানে মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা ঃ

বিপক্ষে যুক্তি ঃ সংবিধানে মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ করার পরয়োজনীয়তা আছে কি না তা নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতবিরোধ লক্ষ্য করা যায়। এ. ভি. ডাইসি প্রমুখ সংবিধান বিশেষজ্ঞদের মতে, যেহেতু সাধারণ আইনের দ্বারা নাগরিক অধিকারগুলি সংরক্ষিত হতে পারে, সেহেতু সেগুলিকে সংবিধানে লিপিবদ্ধ করার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। মার্কিনযুক্ত রাষ্ট্রের সংবিধান গৃহীত হওয়ার সময় হ্যামিলটন (Hamilton) এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে, জনমত এবং জনসাধারণ ও সরকারের সাধারণ উৎসাহ-উদ্দীপনার দ্বারাই অধিকারসমূহ সংরক্ষিত হতে পারে।

সপক্ষে যুক্তি ঃ

টমাস জেফারসন(Thomas Jefferson) প্রমুখ হ্যামিলটনের উক্ত যুক্তি মেনে নিতে পারেন নি। তাঁরা সংবিধানে অধিকার লিপিবদ্ধ করার সপক্ষে কতকগুলি যুক্তির অবতারণা করেন। এই বিতর্কে শেষ পর্যন্ত জেফারসনের অভিমতই প্রাধান্য লাভ করে। তাঁদের অভিমতগুলি নিম্নরূপভাবে আলোচনা করা হল।

১) ভারতীয় সমাজ হল একটি বহুত্ববাদী সমাজ(pluralist society)। এখানে বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম, বর্ণ, সংস্কৃতি প্রভৃতি রয়েছে। তাই এরূপ সমাজে জাতি গঠন যথেষ্ট কষ্টকর। সংবিধানের স্রষ্টারা এই সত্যটি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই সংবিধানের তৃতীয় অংশে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা প্রভৃতি নির্বিশেষে কতকগুলি মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধকরণের মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য ও সংহতিকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। সুতরাং বলা যায়, জাতিগঠনের ঐকান্তিক আকাঙ্খার জন্যই ভারতীয় সংবিধানে মৌলিক অধিকারসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল।

২) বিশ্বের বিভিন্ন দেশের লিখিত সংবিধানের মধ্যে নাগরিক-অধিকারসমূহকে লিপিবদ্ধ করার প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। মার্কিন, ফরাসি, আইরিশ সংবিধানের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়ে সংবিধানের তৃতীয় অংশে মৌলিক অধিকারসমূহকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে বলে মনে করা হয়।

৩) গণতান্ত্রি শাসনব্যবস্থা দলীয় শাসনব্যবস্থা হওয়ায় নির্বাচনে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে সক্ষম হয়, সেই দল সরকার গঠন করে। কিন্তু ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর শাসক দল অনেক সময় জনগণের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার পরিবর্তে নিজেদের ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থরক্ষায় অধিক মনোযোগী হয়ে ওঠে। এর বিরুদ্ধে বিরোধী পক্ষ এবং জনসাধারণ প্রতিবাদ করলে ক্ষমতাসীন শ্রেণী জনগণের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহ খর্ব করে সকল প্রকার সমালোচনার কন্ঠরোধ করে থাকে। এইভাবে শাসকশ্রেণী গণতন্ত্রের পরিবর্তে স্বৈরাচারী পথ গ্রহণ করে। কিন্তু নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা থাকলে শাসক দল সহজে সেগুলিকে খর্ব করতে কিংবা স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে পারে না। তাই সংবিধানে মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধকরণকে গণতন্ত্রের অন্যতম রক্ষাকবচ বলে ডি. এন. ব্যানার্জি প্রমুখ মনে করেন।

৪) গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন প্রবর্তিত হয়। সংবিধানে মৌলিক অধিকারগুলি ঘোষিত হলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ অতি সহজেই রক্ষিত হতে পারে। কারণ, শাসনবিভাগ বা আইনবিভাগ সংখ্যালঘুশ্রেণী বা সম্প্রদায়ের গণতান্ত্রিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করলে তা প্রতিরোধ করার কাজে বিচারবিভাগ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

৫) অনেকে এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, অধিকারগুলি সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হলে কোনগুলি তাদের অধিকার সে সম্পর্কে জনগণ অবহিত থাকে। কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান কিংবা সরকার তাদের সেইসব অধিকারে হস্তক্ষেপ করলে জনসাধারণ সচেতনভাবে তা প্রতিরোধ করে নিজেদের অধিকার রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে।

৬) যে-কোন দেশের সংবিধান হল সেই দেশের সর্ব্বোচ্চ ও মৌলিক আইন। তাই সংবিধানের মধ্যে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহকে লিপিবদ্ধ করার অর্থ সেগুলিকে মৌলিক আইনের মর্যাদা দান করা। এইভাবে লিপিবদ্ধ করার ফলে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি কেবল বিশেষ মর্যাদামণ্ডিত হয়ে ওঠে না, সাথে সাথে সেগুলিকে মান্য করতে যে-কোন ব্যক্তি, সংঘ, প্রতিষ্ঠান এমনকি সরকারও বাধ্য থাকে। কারণ এগুলিকে রক্ষা করার জন্য আদালত এগিয়ে আসে।

তবে পরিশেষে এ কথা বলতে কোন দ্বিধা নেই যে, সংবিধানে মৌলিক অধিকারগুলি লিপিবদ্ধ করা হলেই যে জনসাধারণ তা পরিপূর্ণভাবে ভোগ করতে পারবে - এমন কোন কথা নেই। বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির সংবিধানে স্বীকৃত অধিকারগুলি জনসাধারণ ততদিন ভোগ করতে পারে, যতদিন পর্যন্ত প্রচলিত বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থার স্থিতাবস্থার বজায় থাকে। কিন্তু এই স্থিতাবস্থা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হলে ক্ষমতাসীন শাসকশ্রেণী নানা উপায়ে, বিশেষতঃ সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে জনসাধারণকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে দ্বিধাবোধ করে না। এরূপ ক্ষেত্রে সংবিধানে মৌলিক অধিকার সমূহকে লিপিবদ্ধ করেও সরকারের স্বৈরাচারী মনোভাবকে প্রতিরোধ করা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য বলে মনে করা হয়। ভারতের ক্ষেত্রেও একই যুক্তি সমভাবে প্রযোজ্য।

ভারতীয় সংবিধানে লিপিবদ্ধ মৌলিক অধিকারগুলির বৈশিষ্ট্য ঃ

ভারতীয় সংবিধানে মৌলিক অধিকারগুলির আলোচনা যেরূপ বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে বিশ্বের আর কোন দেশের সংবিধানে সেরূপ করা হয় নি। ভারতীয় সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত ও ঘোষিত মৌলিক অধিকারগুলির বিশেষ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এগুলি নিম্নরূপ ঃ

১) ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অংশে বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলি লিপিবদ্ধ করার সময় সংবিধান প্রণেতাগণ বিভিন্ন উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক দেশের সংবিধান ও তত্ত্বের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। উদাহরণ হিসাবে 'মানবাধিকার সংক্রান্ত ফরাসি ঘোষণা', মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'অধিকারের সনদ', ডাইসির 'আইনের অনুশাসন তত্ত্ব', গান্ধিবাদ প্রভৃতির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

২) ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অংশে স্বীকৃত মৌলিক অধিকারগুলিকে প্রধানতঃ দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা ঃ ক) নেতিবাচক অধিকার ও খ) ইতিবাচক অধিকার। যে সকল অধিকার রাষ্ট্রের প্রতি নিষেধাজ্ঞামূলক, সেগুলিকে নেতিবাচক অধিকার বলা হয়। যেমন আইনের দৃষ্টিতে সমতা ও আইন কর্তৃক সমভাবে রক্ষিত হওয়ার অধিকার (১৪ নং ধারা); জাতি, ধর্ম, বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান সুযোগ-সুবিধার অধিকার [১৫(১) নং ধারা]; জীবন অথবা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার [২১ নং ধারা]-গুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সকল অধিকারগুলি নাগরিকদের প্রদান করতে গিয়ে রাষ্ট্র কি কি করতে পারবে না, সে কথাই বলা হয়েছে। আবার, কতকগুলি অধিকার নাগরিকদের প্রত্যক্ষভাবে প্রদান করা হয়েছে। সেগুলিকে ইতিবাচক অধিকার বলা হয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার [১৯(১) নং ধারা], শিক্ষার অধিকার [২১-ক নং ধারা] ইত্যাদির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৩) ভারতীয় সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত অধিকারগুলিকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়; প্রথম শ্রেণীভুক্ত অধিকারগুলিকে মৌলিক অধিকার [তৃতীয় অংশ] এবং দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত অধিকারগুলিকে রাষ্ট্র-পরিচালনের নির্দেশমূলক নীতি [চতুর্থ অংশ] বলে অভিহিত করা হয়েছে। মৌলিক অধিকারগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য। কিন্তু নির্দেশমূলক নীতিগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য নয়।

৪) মৌলিক অধিকারগুলির মধ্যে এমন কতকগুলি অধিকার রয়েছে, যেগুলিকে ভারতের নাগরিক ও অনাগরিক নির্বিশেষে সবাই ভোগ করতে পারে। যেমন আইনের দৃষ্টিতে সাম্যের অধিকার, জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু আবার কতকগুলি অধিকার কেবল ভারতীয় নাগরিকগণ ভোগ করতে পারে। যেমন - বাক স্বাধীনতা, শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হওয়ার অধিকার, ভারতের যে-কোন স্থানে যাতায়াত ও বসবাস করার অধিকার, সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ক অধিকার ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

৫) ভারতীয় নাগরিকদের ব্যক্তি সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য মৌলিক অধিকারগুলিকে অপরিহার্য মনে করা হলেও অধিকারগুলির কোনটিই অবাধ ও সীমাহীন নয়। ভারতীয় নাগরিকদের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকারের ওপর বিধীনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, বাক-স্বাধীনতা, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, সভা-সমিতি করার অধিকার ইত্যাদির মত মৌলিক অধিকার রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, সদাচার প্রভৃতি শর্তের অধীন। কোন কোন ক্ষেত্রে সংবিধান নিজেই বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। আবার, কোন কোন ক্ষেত্রে পার্লামেন্টকে বিধিনিষেধ আরোপ করার ক্ষমতা প্রদান করেছে। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে অধিকারগুলি মৌলিক বলে বিবেচিত হবে, বিধিনিষেধগুলি নয়। কিন্তু এম. এন. সিং-এর মতে, অধিকারগুলির মতো বিধিনিষেধগুলিকেও মৌলিক বলে মনে করাই সমীচীন।

৬) আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের যথেচ্ছাচারের হাত থেকে রক্ষা করে নাগরিকদের ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য ভারতীয় সংবিধানে মৌলিক অধিকারগুলি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কেন্দ্রের বা রাজ্যের আইনসভা কর্তৃক প্রণীত কোন আইন সংবিধানের তৃতীয় অংশে বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলির বিরোধী হলে আদালত সেই আইন বাতিল করে দিয়ে অধিকারগুলির পবিত্রতা রক্ষা করে। উদাহরণ হিসাবে মিনার্ভা মিলস মামলায়(১৯৮০) সুপ্রিমকোর্টের রায়দানের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৭৬ সালের ৪২-তম সংবিধান সংশোধনী আইনের ৪ ও ৫৫ নং ধারায় বলা হয় যে, নির্দেশমূলক নীতির যে-কোনো একটি বা সবগুলিকে কার্যকর করতে গিয়ে কোনো আইন প্রণীত হলে আদালতে তা নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলা যাবে না। মিনার্ভা মিলস মামলায় কোর্ট ওই দুটি ধারাকে বাতিল বলে ঘোষণা করে। এইভাবে মৌলিক অধিকারকে কেন্দ্র করে আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের সঙ্গে বিচার বিভাগের তীব্র বিরোধ শুরু হয়।

৭) ভারতীয় সংবিধানে নাগরিকদের যে সকল মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তার মধ্যে অনেকগুলিকে মৌলিক অধিকার বলা যায় না। উদাহরণ হিসাবে অস্পৃশ্যতা বর্জন (১৭ নং ধারা) কিংবা রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত উপাধি ছাড়া অন্য কোনো রাষ্ট্রের প্রদত্ত উপাধি গ্রহণ না করার (১৮ নং ধারা) কথা উল্লেখ করা যায়।

৮) সাধারণ অবস্থায় আদালত মৌলিক অধিকারগুলিকে বলবৎ করে। কিন্তু দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষিত হলে রাষ্ট্রপতি আদেশ জারি করে মৌলিক অধিকার বলবৎকরণের জন্য আদালতের কাছে আবেদন করার অধিকার বাতিল করে দিতে পারে। তবে ৪৪-তম সংবিধান সংশোধনে বলা হয় যে, জরুরী অবস্থার সময়েও রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ২০ এবং ২১ নং ধারা দুটিকে সাময়িকভাবে হলেও বাতিল করতে পারবে না।

৯) পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানের মতো মৌলিক অধিকারগুলিকে বাস্তবে কার্যকর করার কোন ব্যবস্থা ভারতীয় সংবিধানে গ্রহণ করা হয় নি। পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নে বাকস্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রভৃতি অধিকারকে যথাযথভাবে কার্যকর করার জন্য কাগজ, ছাপাখানা প্রভৃতি জনগণের ব্যবহারের জন্য দেওয়া হত। কিন্তু ভারতে এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি।

১০) ভারতের সংবিধানে জনগণের অর্থনৈতিক অধিকারসমূহকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়নি। তার পরিবর্তে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকে মৌলিক অধিকার বলে স্বীকৃতি প্রদান করে মূল ভারতীয় সংবিধান ভারতে বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থা কায়েম করেছিল। ৪৪-তম সংবিধান সংশোধনের ফলে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার বর্তমানে মৌলিক অধিকারের কৌলিন্য হারালেও তা বিধিবদ্ধ আইনের অন্তর্ভূক্ত বলে বিবেচিত হয় [৩০০-ক নং ধারা]। তবে এরূপ সংবিধান সংশোধনের ফলেও ভারতের আর্থসামাজিক ব্যবস্থার মৌলিক কোন পরিবর্তন সাধিত হয়নি।

১১) ভারতীয় সংবিধানে যেসকল অধিকার লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, সেগুলি প্রকৃতিগতভাবে নমনীয়। বিভিন্ন সময়ে পার্লামেন্ট সংবিধান সংশোধন করে অধিকারসমূহের পরিবর্তন সাধনে সমর্থ হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে ১৯৭১ সালে ২৪-তম ও ২৫-তম, ১৯৭৬ সালে ৪২-তম এবং ১৯৭৮ সালে ৪৪-তম সংবিধান সংশোধনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। উক্ত উদাহরণ থেকে একথা স্পষ্ট যে, ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত মৌলিক অধিকারগুলিকে সহজেই পরিবর্তন করা সম্ভব।

১২) ভারতে মৌলিক অধিকারসমূহকে যথাযথভাবে সংরক্ষণের দায়িত্ব বিচার বিভাগের হাতে অর্পণ করা হলেও বিভিন্ন সময়ে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে বিচার বিভাগের সেই ক্ষমতাকে সংকুচিত করা হয়েছে। যেমন, ১৯৭৩ সালে সুপ্রিমকোর্ট ঘোষণা করে যে, মৌলিক কাঠামো অপরিবর্তিত রেখে ভারতে পার্লামেন্ট সংবিধানের তৃতীয় অংশ সংশোধন করতে পারে। কিন্তু ৪২-তম সংবিধান সংশোধন করে সংবিধান সংশোধনের বৈধতা বিচারের ক্ষমতা সুপ্রিমকোর্টের হাত থেকে কেড়ে নাওয়া হয়। তবে মিনার্ভা মিলস মামলায় (১৯৮০) সুপ্রিমকোর্ট ৪২-তম সংবিধান সংশোধনী আইনের একটি অংশ বাতিল করে দিয়েছে। তবে একথা সত্য যে, ভারতের বিচারবিভাগ পার্লামেন্ট অপেক্ষা কম শক্তিশালী। অবশ্য বিশ শতকের আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে বিচার-বিভাগের অতি-সক্রিয়তা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যয়।

১৩) মার্কিন সংবিধানে ‘স্বাভাবিক অধিকার’-এর নীতিটি কেবল গৃহীতই হয়নি, সেই সাথে এ কথাও বলা হয়েছে যে, যে সকল অধিকারের কথা সংবিধানে অনুল্লেখ থেকে গেছে সেই সকল অধিকার থেকেও নাগরিকদের বঞ্চিত করা যাবে না। কিন্তু ভারতীয় সংবিধানে স্বাভাবিক অধিকারের নীতিটিকে গ্রহণ করা হয় নি। এখানে সংবিধানের তৃতীয় অংশে বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলি ছাড়া নাগরিকদের অন্য কোনো মৌলিক অধিকার দাবী করতে পারে না।

১৪) ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত মৌলিক অধিকারগুলি প্রকৃতিগতভাবে অসাম্প্রদায়িক। সংবিধানের ১৪ - ১৬ নং ধারায় স্বীকৃত সাম্যের অধিকার কিংবা ২৫ - ২৮ নং ধারায় বর্ণিত স্বাধীনতার অধিকারের প্রকৃতি বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, আইনের দৃষ্টিতে ধর্ম, বর্ণ, জাতি, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই সমান বলে বিবেচিত হয়। তাছাড়া রাষ্ট্র কোনো বিশেষ ধর্ম বা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করে না। আবার, ওই সকল অধিকারের ওপর বাধানিষেধ আরোপের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্র কোনোরূপ পক্ষপাতিত্ব বা বৈষম্যমূলক আচরণ করে না।

১৫) ভারতের সংসদীয় শাসনব্যবস্থার সাফল্যের জন্য সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার সংবিধানের ৩২৬ নং ধারায় স্বীকৃতি লাভ করেছে। কিন্তু ভোটাধিকারের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অধিকারটি নাগরিকদের মৌলিক অধিকার বলে সংবিধান স্বীকৃতি প্রদান করেনি।

১৬) ভারতের মূল সংবিধানে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহের কথাই কেবল বলা হয়েছিল, তাদের কর্তব্য সম্পর্কে কোনো কথা বলা হয় নি। ১৯৭৬ সালে ৪২-তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংযোজিত সংবিধানে ৪-ক অংশ (Part-IV A) -এ ৫১-ক নং ধারায় নাগরিকদের ১০টি মৌলিক কর্তব্য পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর পর ২০০২ সালে ৮৬-তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে ওই ধারায় আরও একটি কর্তব্য পালনের কথা বলার ফলে বর্তমানে ভারতীয় নাগরিকদের পালনীয় কর্তব্যের সংখ্যা ১১-তে দাঁড়িয়েছে।

১৭) ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অংশে নাগরিকদের বিভিন্ন প্রকার মৌলিক অধিকার প্রদানের মাধ্যমে ব্যক্তিস্বার্থকে রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু ব্যক্তিস্বার্থের সাথে যাতে সমগ্রসমাজের স্বার্থের সংঘাত ঘটতে না পারে, সেজন্য ওই সকল অধিকারের ওপর নানা ধরনের যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এইভাবে সংবিধান-প্রণেতাগণ ব্যক্তিস্বার্থের সাথে সামাজিক স্বার্থের সমন্বয়সাধনের চেষ্টা করেছেন বলে দাবি করা হয়।

ভারতীয় সংবিধানে সংরক্ষিত মৌলিক অধিকার সমূহ

(Fundamental Rights guaranteed in the Constitution of India) ঃ

ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অংশে (Part - III) নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সংবিধানের ১২ থেকে ৩৫ নং ধারা পর্যন্ত মৌলিক অধিকারসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। একটি টেবিলের আকারে আমরা মৌলিক অধিকারগুলির কোন কোন অধিকার কোন কোন ধারায় লিপিবদ্ধ আছে তা সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে পারি।

১)	সাধারণ আলোচনা	১২ - ১৩ নং ধারা
২)	সাম্যের অধিকার	১৪ - ১৮ নং ধারা
৩)	স্বাধীনতার অধিকার	১৯ - ২২ নং ধারা
৪)	শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার	২৩ - ২৪ নং ধারা
৫)	ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার	২৫ - ২৮ নং ধারা
৬)	সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ক অধিকার	২৯ - ৩০ নং ধারা
৭)	সাংবিধঅনিক প্রতিবিধানের অধিকার	৩২ ও ২২৬ নং ধারা
৮)	বিশেষ অবস্থায় পার্লামেন্ট কর্তৃক আরোপিত বাধানিষেধসমূহ	৩৩ - ৩৫ নং ধারা

সাম্যের অধিকার (Right to Equality)ঃ

সাম্য বলতে বোঝায় ধনী-নির্ধন, অভিজাত-অভাজন, স্ত্রী-পুরুষ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ প্রভৃতি নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষকে তার আত্মবিকাশের উপযোগী সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান। অধ্যাপক হ্যারল্ড ল্যাস্কির(Harold Laski) মতে, সমাজের মধ্যে যদি বিশেষ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা বর্তমান থাকে, তাহলে জনগণের কোনদিন স্বাধীনতা থাকতে পারে না। তাই সাম্যের অধিকার আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজে স্বীকৃতি লাভ করছে। ভারতেও সাম্যের অধিকার সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

আইনের দৃষ্টিতে সাম্যের অধিকার ঃ ভারতীয় সংবিধানের ১৪ - ১৮ নং ধারায় সাম্যের অধিকার ঘোষিত ও স্বীকৃত হয়েছে। ১৪ নং ধারায় বলা হয়েছে ভারতের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে রাষ্ট্র কোনো ব্যক্তিকে 'আইনের দৃষ্টিতে সমতা' (equality before the law) কিংবা 'আইনসমূহ কর্তৃক সমভাবে রক্ষিত'(equal protection of laws) হওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে না। 'আইনের দৃষ্টিতে সমতা' কথাগুলি ব্রিটেনের সাধারণ আইন থেকে সংগৃহীত হয়েছে। ডাইসির 'আইনের অনুশাসন' (rule of law) তত্ত্বের দ্বিতীয় নীতিটি হল আইনের দৃষ্টিতে সমতা। ১৯৬০ সালে বিচারপতি সুব্বা রাও 'আইনের দৃষ্টিতে সমতা'কে 'একটি নেতিবাচক ধারণা' (a negative concept) বলে চিহ্নিত করেছিলেন। কারণ, এই কথাটির অর্থ হল - কেউই বিশেষ কোনো সুযোগ-সুবিধা(special privilage) দাবি করতে পারে না এবং সকল শ্রেণীর নাগরিকই দেশের সাধারণ আইনের দ্বারা সমভাবে সংরক্ষিত হবে।

ক্ষমতা, পদমর্যাদা ও অবস্থা নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিক সাধারণ আইনের অধীন এবং সাধারণ আদালতের কাছে একই রকম বেআইনি কাজের জন্য সকলকেই সমানভাবে দায়ি থাকতে হয়। এ বিষয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রীর সাথে একজন সাধারণ কৃষকের কোনো পার্থক্য নেই। এই বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে আইভর জেনিংস (Ivor Jennings) বলেন আইনের দৃষ্টিতে সমতা বলতে বোঝায়, 'সমকক্ষদের মধ্যে আইন সমান ও সমভাবে প্রযোজ্য হবে' এবং একই ধরনের কাজের জন্য প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক জাতি, সম্পদ, সামাজিক মর্যাদা কিংবা রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি নির্বিশেষে আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় অনুযায়ী, আইনের অনুশাসন দাবী করে যে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষার চরম অপ্রয়োজনীয়তার সময়েও কোনো ব্যক্তির সাথে 'কঠোর, বর্বর, কিংবা বৈষম্যমূলক আচরণ' করা চলবে না।

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ঃ ‘ভারতের আইনের দৃষ্টিতে সমতা’ নীতির কতকগুলি ব্যতিক্রম (exception) বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এগুলি হল ঃ ১) রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালগণ পদাধিকারবলে যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ এবং কর্তব্য সম্পাদন করেন কিংবা তা করতে গিয়ে যে সকল কার্য করেন, সেজন্য তাদের কোনো আদালতের কাছে কৈফিয়ত দিতে হয় না। ২) রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালগণ যতদিন স্বপদে বহাল থাকেন, ততদিন পর্যন্ত তাঁদের বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারি মামলা দায়ের করা যায় না। ৩) স্বপদে বহাল থাকা কালীন এঁদের গ্রেফতার বা কারাবাসের জন্য কোনো আদালত নির্দেশ দিতে পারে না। ৪) এমনকি, স্বপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে বা পরে সম্পাদিত ব্যক্তিগত কার্যাবলির জন্য রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালদের বিরুদ্ধে দেওয়ানি মামলা দায়ের করার জন্য ২ মাসের নোটিস দিতে হয়।

উক্ত সাংবিধানিক ব্যতিক্রম ছাড়াও অন্যান্য কয়েকটি ক্ষেত্রে ‘আইনের দৃষ্টিতে সাম্য’ নীতির ব্যতিক্রম দেখা যায়। এগুলি হল ঃ ৫) বিদেশি রাষ্ট্রের শাসকদের এবং রাষ্ট্রদূত ও দূতাবাসের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যায় না। কারণ, তাঁরা ভারতীয় আদালতের এক্তিয়ারভুক্ত নয়।

৬) যুদ্ধকালীন অবস্থায় শত্রুপক্ষের ব্যক্তিরা ভারতীয় আদালতে মামলা রুজু করতে এবং অন্যান্য বন্দিদের মতো সুযোসুবিধা দাবি করতে পারে না।

৭) পার্লামেন্ট এবং রাজ্য আইনসভার সদস্যরা বেশ কয়েকটি ‘বিশেষাধিকার ভোগ করেন।

৮) ৪৪-তম সংবিধান সংশোধন সংশোধনী আইন (১৯৭৮) অনুযায়ী পার্লামেন্ট আইন প্রণয়নের মাধ্যমে প্রশাসনিক আদালত গঠন করতে পারে। যেকোন সরকারি কর্মচারী, স্থানীয় সংস্থা বা সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীবৃন্দের চাকুরি-সংক্রান্ত যাবতীয় বিরোধ নিষ্পত্তির দায়িত্ব ট্রাইবুনালের হাতে অর্পণ করা হয়। তাছাড়া শিক্ষা, ভূমিসংস্কার, খাদ্য সংগ্রহ ও বন্টন প্রভৃতি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্যও সংশ্লিষ্ট আইনসভা আইনের মাধ্যমে ট্রাইবুনাল গঠন করতে পারে।

আইন কর্তৃক সমভাবে রক্ষিত হওয়ার অধিকার ঃ

সংবিধানের ১৪ নং ধারার দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত 'আইন কর্তৃক সমভাবে রক্ষিত হওয়ার অধিকারটি মার্কিন সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী আইনের ১ নং ধারা থেকে সংগৃহীত হয়েছে। ১৯৬০ সালে প্রদত্ত একটি মামলার রায়ে বিচারপতি সুব্বা রাও এই অধিকারটিকে 'একটি ইতিবাচক' ধারণা (a positive concept) বলে চিহ্নিত করেছিলেন। তাঁর মতে, আইন কর্তৃক সমভাবে রক্ষিত হওয়া বলতে বোঝায় - সমান অবস্থায় সমপর্যায়ভুক্ত সকল ব্যক্তির প্রতি আইন সমান আচরণ করবে এবং সকলকে সমানভাবে রক্ষা করবে।

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ঃ

এর অর্থ এই নয় যে, অবস্থার বিচারবিশ্লেষণ না করে প্রতিটি আইন সকলের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রতিটি ব্যক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে এবং প্রতিটি পৃথক ক্ষেত্রে আইন পৃথকভাবে প্রযোজ্য হবে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, যারাই আয় করে, তাদের সবাইকে আয়কর প্রদান করতে হয় না। আয়ের পরিমাণের ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন হারে আয়কর প্রদান করতে হয়। তবে এই শ্রেণীবিভাজনের ভিত্তি যথার্থ ও সুস্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং যে উদ্দেশ্যে আইন প্রণীত হয়েছে, সেই উদ্দেশ্যের সঙ্গে তার যুক্তিসঙ্গত সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন।

সুতরাং যুক্তিসঙ্গতভাবে আইনসভা বিভিন্ন ব্যক্তির শ্রেণীবিভাজন করে আইন প্রণয়ন করলেও তা 'আইন কর্তৃক সমভাবে সংরক্ষিত হওয়ার' অধিকারকে খর্ব করে না। কোন আইন যদি সমপর্যায়ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে বৈষম্যমূলক আচরণ করে, সেক্ষেত্রে আদালত সেই আইন বাতিল করে দিতে পারে। 'আইন কর্তৃক সমভাবে রক্ষিত হওয়া' বলতে কেবল বৈষম্যমূলক আইনের হাত থেকে সংরক্ষণ করাকেই বোঝায় না, আইনের বৈষম্যমূলক প্রয়োগের হাত থেকেও সংরক্ষণকে বোঝায়। কোনো আইন কিংবা তার প্রয়োগ বৈষম্যমূলক কিনা তা বিচার করার দায়িত্ব আদালতের হাতে ন্যস্ত হয়েছে। এইভাবে সংবিধানের ১৪ নং ধারাটি ভারতের বিচারালয়ের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

সাম্যের অধিকারের অবাস্তবতা ঃ কিন্তু সাম্যের অধিকার তত্ত্বগতভাবে স্বীকৃত হলেও বাস্তবে তা ভারতীয় জনগণের কাছে মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। কারণ, ধনী ব্যক্তিদের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য দরিদ্র জনসাধারণকে আদালতের শরণাপন্ন হতে হয়। কিন্তু মামলা চালাবার মতো ব্যয়ভার বহনের ক্ষমতা তাদের থাকে না। ফলে ধনশালী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলায় অনেক সময় নির্দোষ দরিদ্র ব্যক্তিকে পরাজিত হতে হয়।

ধর্ম, বর্ণ, জাতি ইত্যাদি নির্বিশেষে সকলের সমানাধিকার ঃ সংবিধানের ১৫ নং ধারায় নাগরিকদের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যে, ক) কেবল ধর্ম, জাতি, বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ, জন্মস্থান প্রভৃতি কারণে রাষ্ট্র কোনো নাগরিকের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না। আবার, খ) উপরোক্ত কারণগুলির জন্য সর্বসাধারণের ব্যবহার্য দোকান, হোটেল, রেস্তোরাঁ ও প্রমোদস্থানে প্রবেশের এবং সরকারি অর্থে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে পরিচালিত কিংবা জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত কূপ, জলাশয়, স্নানাগার, পথ ও জনসমাগমের স্থান ব্যবহারের অধিকার থেকে কোনো নাগরিককে বঞ্চিত করা যাবে না। [১৫(২) নং ধারা]।

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ঃ অবশ্য ১) জনস্বার্থে রাষ্ট্র কতকগুলি যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে, যেমন - জনস্বাস্থ্য রক্ষার উদ্দেশ্যে পূর্ববর্ণিত স্থানগুলিতে কোনো ছোঁয়াচে রোগীর প্রবেশ নিষিদ্ধ করে আইন প্রণয়ন করতে পারে। ২) নারী ও শিশুদের উন্নতির জন্য রাষ্ট্র বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম [১৫(৩) নং ধারা]। ৩) সামাজিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসর শ্রেণী এবং তপশিলি জাতি ও উপজাতির নাগরিকদের উন্নতির জন্য রাষ্ট্র বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম [১৫ (৪) নং ধারা]। ৪) ২০০৫ সালে ৯৩-তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সামাজিক ও শিক্ষাগত ক্ষেত্রে অনগ্রসর শ্রেণীভূক্ত নাগরিকদের কিংবা তপশিলি জাতি বা উপজাতিগুলির অগ্রগতির জন্য সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (সংখ্যালঘুদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বাদে) ভর্তির ক্ষেত্রে আসন সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করতে পারবে [১৫(৫) নং ধারা]।

সরকারি চাকরিতে সকলের সমান অধিকার ঃ সংবিধানের ১৬(১) নং ধারায় বলা হয়েছে যে, সরকারি চাকরি বা পদে নিয়োগের ব্যাপারে সকল নাগরিকের সমান সুযোগ সুবিধা থাকবে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, বংশ, জন্মস্থান, বাসস্থান, স্ত্রী-পুরুষ অথবা এদের যে-কোনো একটি কারণের জন্য কোনো নাগরিক সরকারি চাকরি বা পদে নিয়োগের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না কিংবা তার প্রতি কোনো বৈষম্যমূলক আচরণ করা যাবে না[১৬(২) নং ধারা]। সরকারি চাকরি বা পদে নিয়োগ ছাড়াও বেতন, পদোন্নতি, ছুটি, পেনশন প্রভৃতি বিষয়েও এই নিয়ম কার্যকর হবে। এই অধিকার কেবল সম্প্রদায়গত বৈষম্য(communal discrimination)-এর বিরুদ্ধে নয়, সাথে সাথে স্থানীয় অথবা স্ত্রীলোকদের (weaker sex) ক্ষেত্রে বৈষম্য প্রদর্শনের বিরুদ্ধেও রক্ষাকবচ(safeguard) হিসাবে কাজ করে।

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ঃ এক্ষেত্রেও কিছু কিছু ব্যতিক্রম আছে। যেমন ১) পার্লামেন্ট যে-কোনো অঙ্গরাজ্য অথবা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সরকারি চাকরি বা পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাজ্যে বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বসবাসগত যোগ্যতাকে অন্যতম শর্ত হিসাবে আরোপ করতে পারে [১৬(৩) নং ধারা]। কিন্তু কোনো রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে নির্দিষ্ট কোনো অংশের জন্য বসবাসগত যোগ্যতা স্থির করে দেওয়ার ক্ষমতা পার্লামেন্টের নেই। ২) প্রয়োজন মনে করলে রাষ্ট্র আনুন্নত শ্রেণীর নাগরিকদের জন্য কিছু সরকারি পদ বা চাকরি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে [১৬ (৪) নং ধারা]। ৩) সরকারি চাকরিতে তপশিলি জাতি ও উপজাতিগুলির যথেষ্ট প্রতিনিধিত্ব হয়নি বলে মনে করলে রাষ্ট্র ওই সকল চাকরিতে প্রবীণতার ভিত্তিতে এই দুটি জাতিভুক্ত কর্মচারীদের পদোন্নতির জন্য পদ সংরক্ষণ করতে সক্ষম [১৬ (৪)ক নং ধারা]।

২০০০ সালের ৮১-তম সংবিধান সংশোধন অনুসারে কোনো একটি বছরের জন্য সংরক্ষিত পদগুলি পূরণ করা সম্ভব না হলে, পরবর্তী সময়ে ঐ পদগুলিকে একটি স্বতন্ত্র ধরণের শূন্যপদ বলে ধরা হবে। পরবর্তী যে-কোনো বছরে সেই বছরের শূন্যপদ পূরণেরসময় পূর্বোক্ত শূন্যপদ পূরণ করা হলেও সেগুলিকে ওই বছরের শূন্যপদ বলে ধরা হবে না। এইভাবে ৫০% পদ সংরক্ষণের বিধিটিকেও মান্যতা দেওয়া হবে। [১৬ (৪) খ নং ধারা]। ৪) কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত চাকরি সংশ্লিষ্ট ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে [১৬(৫) নং ধারা]। ৫) প্রশাসনিক দক্ষতার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে সরকার তপশিলি জাতি ও উপজাতি ভুক্ত ব্যক্তিদের কেন্দ্র বা রাজ্যের সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করতে পারে [৩৩৫ নং ধারা]। ৬) উপরোক্ত ব্যতিক্রমগুলি ছাড়াও মূল সংবিধানে আর একটি ব্যতিক্রম লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। তা হল - ভারতের নতুন সংবিধান কার্যকর হওয়ার পূর্বে ইঙ্গ-ভারতীয়দের জন্য কয়েকটি সরকারি পদ সংরক্ষিত রাখার যে ব্যবস্থা ছিল, তা ১৯৬০ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত বহাল রাখার ব্যবস্থা করা হয় [৩৬৬ নং ধারা]। ১৯৬০ সালের ২৫শে জানুয়ারি থেকে এই বিশেষ সংরক্ষণ-ব্যবস্থা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।

অস্পৃশ্যতা বর্জন বিষয়ক ব্যবস্থা ঃ

যুগ যুগ ধরে অস্পৃশ্যতা(untouchability) ভারতীয় সমাজজীবনে দুষ্ট ক্ষতের ন্যায় নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিল। স্বাধীন ভারতের সমাজীবন থেকে একে চিরদেনের জন্য মুছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে সংবিধানের ১৭ নং ধারায় অস্পৃশ্যতা বিলোপ সাধনের কথা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা এবং অস্পৃশ্যতা আচরণ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অর্থাৎ অস্পৃশ্য বলে কোনো ভারতীয়কে তার প্রাপ্য অধিকার ও সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হলে কিংবা অসম্মান করলে আইনত শাস্তি পেতে হয়। সংবিধানের এই নির্দেশ কার্যকর করার জন্য ১৯৫৫ সালে 'অস্পৃশ্যতা (অপরাধ) আইন' [(Untouchability Offences) Act, 1955] প্রণীত হয়েছে।

এই আইন অনুসারে ‘অস্পৃশ্য’ বলে কোনো ব্যক্তির হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে কিংবা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত কোনো দেবালয় অথবা দোকান, হোটেল, রেস্তোরাঁ, প্রমোদস্থান প্রভৃতিতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা অপরাধ বলে গণ্য হবে। তা ছাড়া, সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাস্তাঘাট, জল-কল, জলাধার শ্মশান, গোরস্থান ইত্যাদি ব্যবহার করার ক্ষেত্রেও ‘অস্পৃশ্য’ বলে কাউকে বঞ্চিত করা যাবে না। কিন্তু সংবিধান এবং আইন উভয়েই ‘অস্পৃশ্যতা’ আচরণ নিষিদ্ধ করলেও সমাজজীবন থেকে অস্পৃশ্যতা আজই সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হয় নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অস্পৃশ্যতা বর্জন বিষয়ক ধারাটিকে সংবিধানের তৃতীয় অংশে লিপিবদ্ধ না করে চতুর্থ অংশে লিপিবদ্ধ করাকেই অনেকে শ্রেয় বলে মনে করেন।

উপাধি গ্রহণ ও ব্যবস্থা ঃ

১) সংবিধানের ১৮(১) নং ধারায় বলা হয়েছে যে, সামরিক কিংবা শিক্ষাক্ষেত্রে গুণের স্বীকৃতি বিষয়ক উপাধি ছাড়া রাষ্ট্র অন্য কোনো উপাধি প্রদান করবে না। ২) কোনো ভারতীয় নাগরিক বিদেশী রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত উপাধি গ্রহণ করতে পারবে না [১৮(২) নং ধারা]। ৩) আবার, ভারত সরকারের কার্যে নিযুক্ত কোনো বিদেশী ব্যক্তি ভারতের রাষ্ট্রপতির বিনা অনুমতিতে অন্য কোনো রাষ্ট্রের কাছ থেকে উপাধি গ্রহণ করতে পারবে না [১৮(৩) নং ধারা]। ৪) এমনকি, রাষ্ট্রীয় কার্যে নিযুক্ত বা লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত কোনো ব্যক্তি রাষ্ট্রপতির অনুমতি ছাড়া কোনো বিদেশী রাষ্ট্রের উপহার, বেতন বা পদ গ্রহণ করতে পারবে না [১৮(৪) নং ধারা] তবে, ভারত সরকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ভারতরত্ন, পদ্মবিভূষণ, পদ্মভূষণ ও পদ্মশ্রী প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত করার ব্যবস্থা চালু করেছে। রাজা, মহারাজা, নবাব প্রভৃতির মতো এগুলি উপাধি নয়; পুরস্কার বা সম্মানমাত্র। তা ছাড়া, রাষ্ট্র-প্রদত্ত সম্মানসূচক এই সকল পুরস্কার যাঁরা লাভ করেন, তাঁরা নিজেদের নামের পাশে অথবা চিঠির মধ্যে এগুলির কোনো উল্লেখ করতে পারেন না।

পরিশেষে, বলা যায় যে, ভারতীয় সংবিধানে ঘোষিত সাম্যের অধিকারকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে একটি সুদৃঢ় পদক্ষেপ বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। কিন্তু সেই সঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা বাস্তবে মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। বস্তুত, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অসাম্য ও বৈষম্যকে স্বীকার করে নিয়ে আদর্শ গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনের প্রচেষ্টা বালির ওপর সৌধ নির্মাণের মতোই হাস্যকর হয়ে দাঁড়াবে।

স্বাধীনতার অধিকার ঃ

স্বাধীনতার অধিকার একটি গণতান্ত্রিক অধিকার। ভারতীয় সংবিধানে নাগরিকদের ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকার স্বীকার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সংবিধানের ১৯-২২ নং ধারায় স্বাধীনতার অধিকার স্বীকৃতি লাভ করেছে।

ছয় প্রকার স্বাধীনতার অধিকার - বর্তমান সংবিধানে ১৯ (১) নং ধারায় নাগরিকদের ৬ প্রকার স্বাধীনতার অধিকার প্রদান করা হয়েছে, যথা - ১) বাকস্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের অধিকার; ২) শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হওয়ার অধিকার; ৩) সংঘ বা সমিতি গঠনের অধিকার; ৪) ভারতের সর্বত্র চলাফেরা করার অধিকার; ৫) ভারতের যে-কোনো অঞ্চলে স্বাধীনভাবে বসবাস করার অধিকার এবং ৬) যে-কোনো বৃত্তি, পেশা বা ব্যবসাবাণিজ্য করার অধিকার।

মূল সংবিধানে ‘সম্পত্তি দখল, অর্জন ও হস্তান্তর করার অধিকার’ অন্যতম স্বাধীনতার অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। কিন্তু ১৯৭৮ সালে ৪৪-তম সংবিধান সংশোধনী আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সম্পত্তির অধিকারকে মৌলিক অধিকারের অংশ থেকে বাদ দেওয়ার ফলে বর্তমানে তা মৌলিক অধিকারের কৌলীন্য হারিয়ে বিধিবদ্ধ আইনের অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

স্বাধীনতার অধিকারগুলি সীমাহীন নয় ঃ

কোনো আধুনিক রাষ্ট্রের নাগরিকরা কখনোই সীমাহীন নিরঙ্কুষ স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে না। কারণ, অবাধ স্বাধীনতার অর্থই হল স্বেচ্ছাচারিতা, যা সমাজের অকল্যাণ ডেকে আনে। ভারতেও এর ব্যতিক্রম হতে পারে না। এখানে পূর্ববর্ণিত স্বাধীনতার অধিকারগুলির কোনোটিই নিরঙ্কুশ নয়। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে সুপ্রিমকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি বিজন কুমার মুখোপাধ্যায় এ. কে. গোপালন বনাম মাদ্রাজ রাজ্য মামলায় (১৯৫০) মন্তব্য করেছিলেন, চরম ও অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা বলে কোনো কিছু হতে পারে না। কারণ, এরূপ স্বাধীনতা নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। তাই রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করে এগুলির ওপর যাতে 'যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ'(reasonable restriction) আরোপ করতে পারে, তার ব্যবস্থা ভারতীয় সংবিধানে করা হয়েছে। এখানে 'রাষ্ট্র' বলতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য আইনসভাগুলি ছাড়াও পৌরসভা, ইউনিয়নবোর্ড ইত্যাদির মতো স্থানীয় সরকারি কর্তৃপক্ষকে বোঝায়।

বাক ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা ও তার নিয়ন্ত্রণ ঃ

১) বাক ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার স্বীকৃতি গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনের জন্য একান্ত অপরিহার্য। ভারতের প্রতিটি নাগরিক নিজ ধ্যানধারণা ও বিবেকবুদ্ধি অনুসারে মতামত প্রকাশ করতে পারে। মতামত লিখিত বা মৌখিকভাবে প্রকাশ করা যায়। চিঠিপত্র, পত্রপত্রিকা, পুস্তকপুস্তিকা কিংবা সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে নিজের মতামত প্রকাশ করতে পারে। আবার, সভাসমিতি, আলাপ-আলোচনা, বিতর্ক প্রভৃতির মাধ্যমেও মতামত প্রকাশিত হয়। সরকারের ভুলত্রুটি সমালোচনা করে সরকারকে সংযত থাকতে বাধ্য করার ব্যাপারে সংবাদপত্রগুলির ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু প্রচলিত আইনের বিধান অনুযায়ী কিংবা আইন প্রণয়নের মাধ্যমে রাষ্ট্র নাগরিকদের বাক ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর যে সকল কারণে যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে, সেগুলি হল - ক) ভারতের সার্বভৌমিকতা ও সংহতি (the sovereignity and integrity of India) রক্ষা; খ) রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা রক্ষা; গ) বৈদেশিক রাষ্ট্রের সাথে মৈত্রীবন্ধন সংরক্ষণ; ঘ) দেশে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা; ঙ) শালীনতা ও সদাচার রক্ষা; চ) আদালত অবমাননা প্রতিরোধ; ছ) মানহানি প্রতিরোধ; জ) অপরাধমূলক কাজে প্ররোচনাদান বন্ধ করা [১৯ (২) নং ধারা]।

সমবেত হওয়ার অধিকার ও তার নিয়ন্ত্রণ ঃ

২) ভারতীয় নাগরিকদের সমবেত হওয়ার অধিকার সংবিধানে স্বীকৃতি লাভ করেছে। জনস্বার্থ সম্পর্কিত কোনো বিষয়ে আলাপ-আলোচনার জন্য জনসমাবেশে সমবেত হওয়ার এবং শোভাযাত্রা করার অধিকার নাগরিকদের আছে। কিন্তু এই অধিকার ৫টি শর্তাধীনে ভোগ করা যেতে পারে। শর্তগুলি হল - ক) সভাসমাবেশ শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হতে হবে; খ) নাগরিকরা নিরস্ত্রভাবে সভাসমাবেশ করতে পারবে এবং গ) জনশৃঙ্খলার প্রয়োজনে রাষ্ট্র এই অধিকারের ওপর যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে। তা ছাড়া ১৬-তম সংবিধান সংশোধনী (১৯৬৩) আইনবলে রাষ্ট্র ঘ) ভারতের সার্বভৌমিকতা এবং ঙ) সংহতি রক্ষার জন্য প্রয়োজনে নাগরিকদের এই অধিকারের ওপর ‘যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ’ আরোপ করতে সক্ষম [১৯ (৪) নং ধারা]।

সংঘ সমিতি গঠনের অধিকার ও তার নিয়ন্ত্রণ ঃ

৩) ভারতীয় নাগরিকদের সংঘ ও সমিতি গঠনের অধিকার আছে। শ্রমিক সংঘ, ক্রীড়া সংঘ, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংঘ বা সমিতি, রাজনৈতিক দল প্রভৃতি গঠন এই অধিকারের অর্ন্তভূক্ত। কিন্তু এই অধিকারটি নিরঙ্কুশ বা অবাধ নয়। ক) বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী নীতি-বিগর্হিত উদ্দেশ্যে গঠিত কিংবা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিঘ্নকারী সংঘ বা সমিতিগুলির ওপর রাষ্ট্র যুক্তিসঙ্গত নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে। খ) তা ছাড়া ভারতের সার্বভৌমিকতা ও সংহতি রক্ষার প্রয়োজনেও রাষ্ট্র এই অধিকারটিকে সংকোচন করতে সক্ষম [১৯ (৪) নং ধারা]। তবে রাষ্ট্র কর্তৃক আরোপিত বাধানিষেধগুলি যুক্তিসঙ্গত কি না, তা বিচার করার ক্ষমতা আদালতের হাতে অর্পিত হয়েছে।

যাতায়াত ও বসবাসের অধিকার ও তার সীমাবদ্ধতা ঃ

১৯ [৪] - [৫] ভারতের সর্বত্র স্বাধীনভাবে যাতায়াত করার এবং যে-কোনো অঞ্চলে বসবাস করার অধিকার প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার। কিন্তু ক) জনস্বার্থে এবং খ) তপশিলভুক্ত উপজাতিগুলির স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র এই দুটি অধিকারের ওপর যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে [১৯(৫) নং ধারা]।

বৃত্তি বা পেশা গ্রহণের অধিকার এবং তার সীমাবদ্ধতা ঃ

৬) ভারতীয় সংবিধান অনুসারে প্রতিটি ভারতীয় নাগরিক নিজ পচ্ছন্দমতো বৃত্তি, পেশা বা ব্যবসাবাণিজ্য করার অধিকারী। কিন্তু জনস্বার্থে রাষ্ট্র এই অধিকারের ওপর যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে। ক) জনস্বার্থ-বিরোধী যে-কোন ব্যবসাবাণিজ্যে সরকার হস্তক্ষেপ করতে সক্ষম; খ) তা ছাড়া, বিভিন্ন বৃত্তির ক্ষেত্রে কর্মীর যোগ্যতা নির্ধারণের ক্ষমতা রাষ্ট্রের আছে [১৯ (৬) নং ধারা]। তবে, স্বাধীনতার অধিকারের ওপর আইন কর্তৃক আরোপিত বাধানিষেধগুলি যুক্তিসঙ্গত কি না, তা বিচার করার ক্ষমতা আদালতের রয়েছে। কোনো আইন অযৌক্তিকভাবে বাধানিষেধ আরোপ করছে বলে মনে করলে আদালত সংশ্লিষ্ট আইন বা তার যে-কোনো অংশ সংবিধানবিরোধী বলে বাতিল করে দিতে পারে।

ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা ঃ

এ পর্যন্ত আলোচনা থেকে এটা বোঝা যাচ্ছে যে, ভারতীয় সংবিধানের ১৯(১) নং ধারাটি একদিকে যেমন নাগরিকদের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ স্বাধীনতার অধিকার প্রদান করেছে, অন্যদিকে তেমনি ১৯ নং ধারার (২) - (৬) নং উপধারাগুলি অধিকারসমূহের ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ আরোপের ব্যবস্থা করেছে। এইভাবে ভারতীয় সংবিধান ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছে।

দোষী সাব্যস্ত করা ও শাস্তিদান সম্পর্কিত ব্যবস্থাবলি ঃ

ভারতীয় নাগরিকদের স্বাধীনতার অধিকার যথার্থভাবে সংরক্ষণের জন্য সংবিধানে আরও কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে, প্রথমতঃ ২০(১) নং ধারায় বলা হয়েছে যে, প্রচলিত আইন ভঙ্গের অপরাধ ছাড়া কোনো ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া যাবে না এবং প্রচলিত আইন ভঙ্গের জন্য প্রচলিত আইন অনুসারেই শাস্তি দিতে হবে। কোনো নতুন আইন প্রণয়ন করে পূর্বে সম্পাদিত অপরাধের বিচার করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ কোনো ব্যক্তিকে একই অপরাধের জন্য একাধিকবার শাস্তি প্রদান করা যাবে না [২০(২) নং ধারা]। এখানে 'শাস্তিপ্রদান' বলতে আইনভঙ্গের অপরাধে বিচারবিভাগ কর্তৃক শাস্তিবিধানের কথা বলা হয়েছে। কোনো আইন যদি একই অপরাধের জন্য একাধিকবার শাস্তির ব্যবস্থা করে, তাহলে সেই আইন সংবিধান বিরোধী বলে বাতিল হয়ে যাবে। তবে কোনো সরকারি বা বেসরকারি কর্মচারী আদালতে একবার শাস্তি পাওয়ার পরও যদি তার কর্মস্থলে কর্তৃপক্ষের দ্বারা দ্বিতীয়বার শাস্তি লাভ করে, সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের কাজ সংবিধান বিরোধী বলে বিবেচিত হবে না। তৃতীয়তঃ অভিযুক্ত কোনো ব্যক্তিকে নিজের বিরুদ্ধে আদালতে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যায় না। [২০(৩) নং ধারা]।

জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার ঃ

সংবিধানের ২১ নং ধারায় বলা হয়েছে, ‘আইন-নির্দিষ্ট পদ্ধতি’ ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে কোনো ব্যক্তিকে তার জীবন অথবা ব্যক্তি স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যায় না। এর অর্থ হল যথাযথ পদ্ধতি অনুসারে প্রণীত আইনের সমর্থন লাভ করলেই কেবল শাসন বিভাগ নাগরিকদের জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারে। এইভাবে সংবিধানের ২১ নং ধারাটি শাসন বিভাগের স্বেচ্ছাচারী বা বেআইনী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ব্যক্তিকে রক্ষা করলেও এই ধারা আইন বিভাগের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ বলে বিবেচিত হয় না বলে দুর্গাদাস বসু অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ব্যক্তি স্বাধীনতার অর্থ ও প্রকৃতি ঃ

২১ নং ধারায় বর্ণিত 'ব্যক্তিস্বাধীনতা' এবং 'আইন-নির্দিষ্ট পদ্ধতি'-র অর্থ ও প্রকৃতি নিয়ে যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে এবং আজও পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়নি। এ প্রসঙ্গে সুপ্রিমকোর্টের বিভন্ন সময়ে বিভিন্ন রায় লক্ষ্য করলে এর সত্যতা আমরা উপলব্ধি করতে পারি। তাই ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণের ক্ষেত্রে ২১ নং ধারায় বর্ণিত আইন-নির্দিষ্ট পদ্ধতির যৌক্তিকতা বিচারের ক্ষমতা আদালতের রয়েছে।

আইনের যথাবিহিত পদ্ধতির অর্থ ও প্রকৃতি ঃ

ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতাগণ মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে বর্ণিত 'আইনের যথাবিহিত পদ্ধতি'র দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে জাপানি সংবিধানের ৩১ নং ধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে 'আইন নির্দিষ্ট পদ্ধতি'র ব্যবস্থাকে সংবিধানে স্থান দেন। কিন্তু প্রশ্ন হল - আইনের যথাবিহিত পদ্ধতি ও আইন নির্দিষ্ট পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য কী ? আইনের যথাবিহিত পদ্ধতি অনুসারে বিচারকার্য সম্পাদন করতে গিয়ে মার্কিন সুপ্রিমকোর্ট কেবল আইনটি যথাযথ পদ্ধতি অনুসারে প্রণীত হয়েছে কি না তা-ই বিচার করে না, সেই সঙ্গে আইনটি 'স্বাভাবিক ন্যায়নীতিবোধ'-এর বিরোধী কি না তা-ও বিচার করে। অন্যভাবে বলা যায়, কোনো আইন ন্যায়সংগত বা যুক্তিসঙ্গত কি না তা বিচার করার ক্ষমতা মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের আছে।

আইন নির্দিষ্ট পদ্ধতির অর্থ ও প্রকৃতি ঃ

কিন্তু ‘আইন নির্দিষ্ট পদ্ধতি’ অনুসারে আদালত কোনো আইনের গুণাগুণ অর্থাৎ কোনো আইন ন্যায়নীতিবিধের বিরোধী কি না, তা বিচার করতে পারে না।। ‘আইন নির্দিষ্ট পদ্ধতি’ বলতে বোঝায় - যে আইন অনুসারে ব্যক্তি স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করা হবে, সেই আইনটি বৈধ আইনসভা কর্তৃক বিধিসম্মতভাবে প্রণীত কি না, তা বিচার করার ক্ষমতা আদালতের থাকবে। কিন্তু কোন আইন স্বাভাবিক ন্যায়নীতিবোধ(Naturai Justice) -এর বিরোধী কি না, তা বিচার করার ক্ষমতা আদালতের থাকে না। যদিও সুপ্রিমকোর্ট এ নিয়ে বিভিন্ন মামলার রায়ের ক্ষেত্রে ভিন্ন অভিমতও ব্যক্ত করেছেন।

শিক্ষার অধিকার ঃ ২০০2 সালে ৮৬-তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের মধ্যে ২১-ক নং ধারাটি সংযোজিত হয়। এই ধারায় শিক্ষার অধিকারকে মৌলিক অধিকারের মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। এই ধারা অনুসারে, রাষ্ট্র ৬-১৪ বছর বয়স্ক প্রতিটি শিশুর জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা অবশ্যই করবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, উন্নিকৃষ্ণন বনাম অন্ধ্রপ্রদেশ মামলায়(১৯৯৩) প্রদত্ত রায়ে সুপ্রিমকোর্ট শিক্ষার অধিকারকে জীবনের অধিকারের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে চিহ্নিত করেছিলেন। এই রায়দানের পর ১৯৯৮ সালে তদানীন্তন যুক্তফ্রন্ট সরকার শিক্ষার অধিকারকে মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভূক্ত করার উদ্দেশ্যে রাজ্যসভায় ৮৩-তম সংবিধান সংশোধন বিল পেশ করেছিল।

ওই বিলে ৬-১৪ বছর বয়স্কদের শিক্ষালাভের অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দানের জন্য ২১-ক নং একটি ধারা সংবিধানে সন্নিবিষ্ট করা হয়। অনেক টালবাহানার পর বি. জে. পি. -র নেতৃত্বাধীন পূর্বতন জোট সরকার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ৯৩-তম সংবিধান সংশোধনী বিল পার্লামেন্টে উত্থাপন করে এবং ২০০২ সালে তা ৮৬-তম সংবিধান সংশোধনী আইন হিসাবে গৃহীত হলে শিক্ষার অধিকার মৌলিক অধিকারের মর্যাদা লাভ করে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার ২০১০ সালের এপ্রিল মাস থেকে এই মৌলিক অধিকারটিকে কার্যকর করার জন্য রাজ্যসরকারগুলিকে নির্দেশ দিয়েছে।

গ্রেফতার ও আটক সম্পর্কিত ব্যবস্থাবলি ঃ

ভারতীয় সংবিধানের ২২ নং ধারায় গ্রেফতার ও আটক সম্পর্কিত ব্যবস্থাবলি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, ১) কোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতার ও আটক করার কারণ জানাতে হবে। ২) আটক ব্যক্তিকে উকিলের মাধ্যমে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। [২২(১) নং ধারা]। ৩) গ্রেফতার করার ২৪ ঘন্টার মধ্যেই আটক ব্যক্তিকে নিকটবর্তী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট আদালতের অনুমতি ছাড়া তাকে অতিরিক্ত সময়ের জন্য কোনোভাবেই আটক রাখা যাবে না[২২(২) নং ধারা]। কিন্তু ক) শত্রুভাবাপন্ন বিদেশি এবং খ) নিবর্তনমূলক আটক আইনে ধৃত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এই সকল নিয়ম প্রযোজ্য হবে না [২২(৩) নং ধারা]।

নিবর্তনমূলক আটকের অর্থ ও প্রকৃতি ঃ

‘নিবর্তনমূলক আটক’ বলতে বোঝায় - কোনো ব্যক্তি অপরাধমূলক কার্যে জড়িত রয়েছে কিংবা ভবিষ্যতে অপরাধ করতে পারে বলে আশঙ্কা করে সরকার সেই ব্যক্তিকে বিনা বিচারে আটক করতে পারে। নিবর্তনমূলক আটকের ক্ষেত্রে সরকারকে গ্রেফতার বা আটকের কারণ দর্শাতে কিংবা আদালতে সামনে সাক্ষ্য-প্রমাণাদি উপস্থিত করতে হয় না। সংবিধানের ২২(৪)-(৭) নং উপধারা অনুসারে নিবর্তন মূলক আটক আইনের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তিকে বিনা বিচারে ৩ মাসের বেশী আটক রাখা যাবে না। এই সময়ের বেশী আটক রাখতে হলে হাইকোর্টে কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অথবা অনুরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন একাধিক ব্যক্তিকে নিয়ে গঠিত একটি উপদেষ্টা পর্ষদের অনুমতি প্রয়োজন। এরূপ আটকের সর্বধিক মেয়াদ কী হবে, তা নির্ধারণ করার ক্ষমতা পার্লামেন্টের রয়েছে [২২(৭) নং ধারা]।

আটকের বিরুদ্ধে সংবিধানে ব্যবস্থা ঃ

যাতে সরকারি কর্তৃপক্ষ যথেচ্ছভাবে নিবর্তনমূলক আটক আইন প্রয়োগ করতে না পারে, সেজন্য সংবিধানের ২২(৫) নং ধারায় বলা হয়েছে যে, আটকাদেশ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে যথাসম্ভব সত্বর আটক ব্যক্তিকে আটকের কারণ জানাতে হবে এবং আটকের বিরুদ্ধে আদালতে আবেদন করার সুযোগ দিতে হবে। অবশ্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যদি আটক করার পেছনে যে সকল তথ্য আছে, সেগুলিকে জনস্বার্থ-এর প্রয়োজনে প্রকাশ করা অনুচিত বলে মনে করে, তাহলে সেই কর্তৃপক্ষ আটক ব্যক্তিকে সেগুলি জানাতে বাধ্য নয় [২২(৬) নং ধারা]।

নিবর্তনমূলক আটকের ক্ষেত্রে আদালতের ভূমিকা ঃ

সংবিধানের ২২(৫) নং ধারাবলে নিবর্তনমূলক আটক আইনের দ্বারা কোনো ব্যক্তিকে আটক করা হলে সে সংবিধানের ৩২ ও ২২৬ নং ধারায় বর্ণিত 'বন্দি প্রত্যক্ষীকরণ' (Habeas Corpus) -এর দাবীতে যথাক্রমে সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্টের কাছে আবেদন করতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে আদালত যে সকল বিষয় বিচারবিবেচনা করে দেখতে পারে, সেগুলি হল - ১) যে-আইন অনুসারে আটক করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, সেই আইনের বৈধতা; ২) আইন কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে আটক করা হয়েছে কি না; ৩) আটককারী কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যত্তিকে আটক করার যে সকল কারণ প্রদর্শন করেছে, সেগুলি যথাযথ ও স্পষ্ট কি না; ৪) যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে আটককারী কর্তৃপক্ষ আটক ব্যক্তিকে প্রাথমিক (initial) অথবা অনুপূরক(supplementary) কারণ দেখিয়েছে কি না এবং ৫) আটটকারী কর্তৃক্ষের আটক করার প্রকৃত ক্ষমতা আছে কি না। উপরোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করে আদালত সন্তুষ্ট হতে না পারলে আটক ব্যক্তিকে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারে।

উপসংহার ঃ

বর্তমান ভারতে ‘কোফেপোসা’(COFEPOSA-Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974) , ‘নাসা’ (NASA – National Security Act, 1980), ‘এসমা’ (ESMA – Essential Services Maintenance Act, 1981), ‘বেআইনি কার্যকলাপ(প্রতিরোধ) সংশোধনী আইন’ [UAPA- Unlawful Activities (Prevention) Amendment Act, 2008] প্রভৃতি আটক আইনের অবস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ২০০৪ সালে ড. মনমোহন সিং-এর নেতৃত্বাধীন সরকার ‘সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধ আইন’ বা ‘পোটা’ (POTA- Prevention of Terrorism Act, 2002) ও ‘টাডা’ [TADA – Terrorist and Disruptive Activities (Prevention Act, 1987 and its amendment in 1993] বাতিল করে দিয়েছে।

তবে বহু বছর পূর্বে প্রণীত ‘বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইন’টি [The Unlawful Activities(Prevention) Act - UAPA] সংশোধিত হওয়ার ফলে এর মাধ্যমেই সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের মোকাবিলা করা সম্ভব বলে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার মনে করেছিলেন। এই সকল আটক আইন ভারতীয় গণতন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত করেছে বলে অনেকে অভিমত ব্যক্ত করেন। বিচারপতি পতঞ্জলি শাস্ত্রী ‘নিবর্তনমূলক আটক’ ব্যবস্থাকে সংবিধানের ‘অশুভ বৈশিষ্ট্য, ‘ব্যক্তি স্বাধীনতার ওপর প্রচন্ড আক্রমণ’ (a serious invasion of personal liberty) ইত্যাদি বলে সমালোচনা করেছেন। পরিশেষে আমরা বিচারপতি মহাজন(Mahajan)-এর ভাষায় বলতে পারি, ‘নিবর্তনমূলক আটক আইনসমূহ গণতান্ত্রিক সংবিধানগুলির বিরোধী এবং বিশ্বের অন্য কোন গণতান্ত্রিক দেশে এগুলির অস্তিত্ব চোখে পড়েনা’।

শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার (Right against Exploitation)ঃ

শোষণ, লাঞ্ছনা ও বঞ্চনা গণতন্ত্রের প্রধান শত্রু। ভারতীয় সংবিধানের ২৩ ও ২৪ নং ধারায় নাগরিকদের শোষণের বিরুদ্ধে অধিকারটি স্বীকৃতি লাভ করেছে। সংবিধানের ২৩(১) নং ধারায় মানুষ নিয়ে ব্যবসা অর্থাৎ মানুষ ক্রয়বিক্রয়, বেগার খাটানো বা অনুরূপভাবে বলপূর্বক শ্রমদানে বাধ্য করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ‘মানুষ ক্রয়বিক্রয়’ বন্ধ করা বলতে এখানে দাসপ্রথা(Slavery) ছাড়াও নীতিবিগর্হিত বা অন্য উদ্দেশ্যে নারী, শিশু প্রভৃতির ক্রয়বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

এছাড়া বেগার খাটানোর মতো যে-কোনো ধরনের বলপূর্বক কাজ করানো ভারতীয় সংবিধান নিষিদ্ধ করেছে। কিন্তু এই অধিকারের ব্যতিক্রমও রয়েছে। যেমন ১) জনস্বার্থে প্রয়োজন মনে করলে রাষ্ট্র ধর্ম, বর্ণ, জাতি ও শ্রেণী নির্বিশেষে সবাইকে শ্রমদানে বাধ্য করতে পারে, ২) আবার, রাষ্ট্র যদি সামরিক শিক্ষাগ্রহণ কিংবা সমাজসেবামূলক কার্য সম্পাদনকে বাধ্যতামূলক বলে আইন প্রণয়ন করে, তবে সেই আইন সংবিধানের ২৩ (১) নং ধারার বিরোধী বলে বিবেচিত হবে না।

সংবিধানের ২৪ নং ধারা অনুসারে, ১৪ বছরের কম বয়স্ক শিশুদের খনি, কারখানা ও অন্য কোনো বিপজ্জনক কার্যে নিয়োগ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই অধিকারটিকে বাস্তবায়িত করার জন্য পার্লামেন্ট ‘কারখানা-সংক্রান্ত আইন’ (Factories Act, 1948); ‘খনি সংক্রান্ত আইন’ (The Mines Act, ১৯৫২); ‘শিশুশ্রমিক (নিষিদ্ধকরণ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন’ [The Child Labour (Prohibition and Regulations) Act, 1986] প্রভৃতি প্রণয়ন করেছে।

উপসংহার ঃ

সংবিধানে শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার স্বীকৃতি লাভ করলেও ভারতে শোষণহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে- এ কথা মনে করার কোনো কারণ নেই। বরং উৎপাদনের উপাদানগুলির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত থাকায় মালিকশ্রেণি অধিক মুনাফা অর্জনের জন্য শ্রমিকশ্রেণিকে ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত করে নির্দয়ভাবে শোষণ করেছে। এ ব্যাপারে রাষ্ট্রের নেতিবাচক ভূমিকা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সুতরাং বলা যায়, কেবল সংবিধানে বলপূর্বক শ্রমদান নিষিদ্ধ করে কিংবা বেগার প্রথার উচ্ছেদ ঘটিয়ে শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যায় না। সেজন্য প্রয়োজন উৎপাদনের উপাদানগুলির ওপর সামাজিক মালিকানার প্রতিষ্ঠা।

ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার (Right to Freedom of Religion) ঃ

ভুমিকা ঃ হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান, বৌদ্ধ, পারসি প্রভৃতি নানা ধর্মের মানুষ যুগ যুগ ধরে ভারতে বসবাস করছে। ব্রিটিশরা ভারতকে নিজেদের পদানত রেখে শোষণ করার জন্য 'বিভক্ত করে শাসন করো' (Divide and Rule) নীতি অনুসরণ করেছিল, ফলে, হিন্দু-মুসলমান দুটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষের মনে বিদ্বেষ বৃদ্ধি পায় এবং শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ চরম আকার ধারণ করলে ভারত দ্বিখণ্ডিত হয়; জন্মলাভ করে ভারত এবং পাকিস্তান নামে দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। কিন্তু পাকিস্তান ধর্মীয় রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলেও ভারত 'ধর্মনিরপেক্ষ'(secular) রাষ্ট্র হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে।

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের অর্থ ঃ ভারত একটি ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হলেও মূল সংবিধানের কোথাও ভারতকে ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ রাষ্ট্র বলে বর্ণনা করা হয়নি। ১৯৭৬ সালের ৪২-তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে প্রস্তাবনায় ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ কথাটি সংযোজন করা হয়েছে। ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ রাষ্ট্র বলতে কী বোঝায়, তা বলতে গিয়ে অনন্তসায়নম আয়েঙ্গার (Anantasayanam Ayyangar) গণপরিষদে মন্তব্য করেছিলেন, ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ বলতে একথা বোঝায় না যে, কোনো ধর্মের প্রতি আমাদের বিশ্বাস নেই এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এর সঙ্গে কোনো সম্পর্কে নেই।

‘ধর্মনিরপেক্ষ’ কথাটির অর্থ হল- রাষ্ট্র কোনো বিশেষ ধর্মকে সাহায্য করবে না বা এক ধর্ম অপেক্ষা অন্য ধর্মকে প্রাধান্য দেবে না। সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে সব ধর্মকে সমান মর্যাদা প্রদান করাকে বোঝায়। রাধাকৃষ্ণণ(Radhakrishnan)-এর মতে, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলতে অধার্মিক(irreligious), ধর্মবিরোধী(anti-religious) কিংবা ধর্ম বিষয়ে উদাসীন (indifferent to religion) রাষ্ট্রকে বোঝায় না। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হল এমন একটি রাষ্ট্র, যা ব্যক্তি ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির ধর্মীয় স্বাধীনতা স্বীকার করে, যা ধর্মীয় মতামত নির্বিশেষে সব ব্যক্তিকে নাগরিক হিসাবে গণ্য করে এবং যা সাংবিধানিকভাবে বিশেষ কোনো ধর্মের সঙ্গে নিজেকে এক করে না কিংবা বিশেষ কোনো ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা বা বোরোধিতা করে না। এক কথায় বলা যায়, ধর্মনির্বিশেষে রাষ্ট্র সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকে।

ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার ও তার নিয়ন্ত্রণ ঃ

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি মোটামুটিভাবে ভারতে বর্তমান রয়েছে। ভারতীয় সংবিধানে ২৫ থেকে ২৮ নং ধারায় জনগণের ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার স্বীকৃতি লাভ করেছে। প্রত্যেক ব্যক্তি বিবেকের স্বাধীনতা এবং ধর্মস্বীকার, ধর্মপালন ও ধর্মপ্রচারের স্বাধীনতা রয়েছে [২৫(১) নং ধারা]। সাধারণভাবে রাষ্ট্র কোনো ধর্মীয় বিষয়ের ওপর হস্তক্ষেপ করতে না পারলেও ১) জনশৃঙ্খলা, সমাজের স্বীকৃত নীতিবোধ, জনস্বাস্থ্য এবং অন্যান্য মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের প্রয়োজনে রাষ্ট্র এই অধিকারের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে। ২) বিশেষ কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান কোনো ধর্মাচরণের অঙ্গ কি না, তা বিচারবিবেচনা করার ক্ষমতা আদালতের রয়েছে বলে ১৯৮৮ সালে সুপ্রিমকোর্ট হানিফ কুরেশি বনাম বিহার রাজ্য মামলায় রায় দিয়েছে। বস্তুত, ধর্মের নামে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, জনস্বার্থ প্রভৃতি বিঘ্নিত হলে কিংবা নরবলির মতো অমানবিক কার্যাবলি অনুষ্ঠিত হলে অথবা সতীদাহ, দেবদাসী প্রথার মতো নীতি-বিগর্হিত আচার-অনুষ্ঠান চলতে থাকলে সামগ্রিকভাবে দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি ব্যাহত হবে। তাই, এসব প্রতিরোধ করার জন্য সংগত কারণে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ একান্তভাবে প্রয়োজন।

৩) সংবিধানে এ কথাও বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্র ধর্মাচরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক, আর্থিক, রাজনৈতিক কিংবা অন্যান্য ধর্মনিরপেক্ষ কার্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে [২৫(২)(খ) নং ধারা]। ৪) সামাজিক কল্যাণসাধন ও সমাজ-সংস্কারের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে সক্ষম। ৫) এমনকি, হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে হিন্দু ধর্মাবলম্বী সব ব্যক্তির কাছে উন্মুক্ত করে দেওয়ার জন্য রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করতে পারে [২৫(২)(খ) নং ধারা]। সংবিধানে 'হিন্দু' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। শিখ, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরাও হলেন 'হিন্দু'। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সংবিধানের ১৯(১) (খ) নং ধারায় নিরস্ত্রভাবে সমবেত হওয়ার কথা বলা হলেও শিখ ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে কৃপাণ ধারণ ও বহনের অধিকার সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। কারণ, কৃপাণ ধারণ ও বহন শিখ ধর্মাচরণের অপরিহার্য অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়।

ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির অধিকার ও তার নিয়ন্ত্রণ ঃ

ব্যক্তি ছাড়াও বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়কে সংবিধানে কতকগুলি অধিকার প্রদান করা হয়েছে। ২৬ নং ধারা অনুসারে প্রতিটি ধর্মীয় সম্প্রদায় বা তার যে-কোনো অংশ ১) ধর্ম বা দানের উদ্দেশ্যে সংস্থা স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে, ২) নিজ নিজ ধর্ম-বিষয়ক কার্যকলাপ নিজেরাই পরিচালনা করতে, ৩) স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন ও ভোগদখল করতে এবং ৪) আইন অনুসারে সম্পত্তি পরিচালনা করতে পারবে। তবে রাষ্ট্র ক) জনশৃঙ্খলা, খ) নৈতিকতা, গ) জনস্বাস্থ্য রক্ষা করার জন্য যে-কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায় বা তার অংশের উপরিউক্ত অধিকারগুলিতে হস্তক্ষেপ করতে পারে।

কোনো ধর্ম বা ধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রসার বা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোনো ব্যক্তিকে কর প্রদানে বাধ্য করা যায় না(২৭ নং ধারা)। কিন্তু মন্দির দর্শন, দেবপূজা ইত্যাদি ব্যাপারে রাষ্ট্র কর ধার্য করার পরিবর্তে বৃত্তি বা অনুদান ধার্য করে সংবিধানের এই বাধানিষেধটিকে এড়িয়ে যেতে পারে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষাদান নিষিদ্ধকরণ ঃ

ভারতীয় সংবিধানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে ধর্মীয় শিক্ষাদানের ওপর কিছু কিছু বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে। ২৮ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, ১) সম্পূর্ণভাবে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্ম-বিষয়ক শিক্ষাদান করা যাবে না। ২) আবার, যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সরকার কর্তৃক স্বীকৃত কিংবা সরকারি অর্থে আংশিকভাবে পরিচালিত, সেগুলিতেও শিক্ষার্থীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে অথবা অপ্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার্থীর অভিভাবকের বিনা অনুমতিতে ধর্মশিক্ষা বাধ্যতামূলক করা যাবে না। কিন্তু রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হলেও কোনো দাতা বা অছির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষা দেওয়া যায়, যদি দাতার উইলে কোনো বিশেষ ধর্ম বিষয়ে শিক্ষাদানের কথা উল্লেখ থাকে।

সংস্কৃতি ও শিক্ষা-বিষয়ক অধিকার ঃ

গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হল সুচিন্তিত ও সুগঠিত জনমত। জনগণ যদি অজ্ঞতা, অশিক্ষা, কুসংস্কার প্রভৃতিতে আচ্ছন্ন থাকে, তবে স্বাভাবিকভাবেই তাদের রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটে না। আর, রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ না ঘটলে গণতন্ত্রের সাফল্যের স্বপ্ন দেখা বাতুলতা মাত্র। ভারতীয় সংবিধানের ২৯ এবং ৩০ নং ধারায় সংস্কৃতি ও শিক্ষা-বিষয়ক অধিকার ঘোষিত হয়েছে। ২৯ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, ১) সব শ্রেণির নাগরিক নিজ নিজ ভাষা, লিপি ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ করার অধিকারী। এই অধিকারের স্বীকৃতির মাধ্যমে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির স্বার্থ সংরক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২) তা ছাড়া, রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত অথবা সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশিধাকার থেকে কোনো ব্যক্তিকে ধর্ম, বংশ, জাতি বা ভাষার অজুহাতে বঞ্চিত করা যাবে না।

তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রবেশাধিকারে জন্য উপযুক্ত যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন। সংবিধানের ৩০ নং ধারা অনুসারে ধর্ম অথবা ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি নিজেদের পচ্ছন্দমতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করতে পারে। এই সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সাহায্য প্রদানের বিষয়ে রাষ্ট্র কোনোরূপ বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না। এরূপ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় ভিত্তিতে আসন সংরক্ষণ রাখা যাবে না। ৩) আবার, রাষ্ট্র সংখ্যালঘু শ্রেণির কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সম্পত্তি অধিগ্রহণ করতে চাইলে তাকে ‘পুরো ক্ষতিপূরণ’ প্রদান করতে হবে [৩০(১-ক)] নং ধারা।

সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার ঃ

সাংবিধানিক প্রতিবিধানের প্রয়োজনীয়তা - সংবিধানে কেবল লিপিবদ্ধ করা হলেই যে মৌলিক অধিকারগুলি সুরক্ষিত হবে হবে, এমন কোনো কথা নেই। আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ প্রভৃতি যে-কোনো সময়ে অধিকারগুলি খর্ব করতে পারে। তাই সাংবিধানিক প্রতিবিধানের মাধ্যমে অধিকারগুলি সংরক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা করা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে একান্ত অপরিহার্য। ড. বি. আর. আম্বেদকার ৩২ নং ধারায় বর্ণিত সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকারকে ‘সংবিধানের আত্মা ও প্রাণকেন্দ্র’ বলে বর্ণনা করেছেন।

আদেশ বা নির্দেশ জারি করে অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা - ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি রক্ষা করার জন্য সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার সংবিধানের ৩২ ও ২২৬ নং ধারায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ৩২ নং ধারা অনুযায়ী মৌলিক অধিকারগুলি বলবৎ ও কার্যকর করার জন্য নাগরিকরা সুপ্রিম কোর্টের কাছে আবেদন করতে পারে। সুপ্রিমকোর্ট এই অধিকারগুলি বলবৎ করার জন্য বন্দি প্রত্যক্ষীকরণ, পরমাদেশ, প্রতিষেধ, অধিকার-পৃচ্ছা ও উৎপ্রেষণ প্রভৃতি লেখ (Writ), নির্দেশ (Direction) বা আদেশ (Order) জারি করতে সক্ষম। অনুরূপভাবে ২২৬ নং ধারা অনুসারে অঙ্গরাজ্যগুলির হাইকোর্ট আদেশ বা নির্দেশ জারি করে অধিকারগুলি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। তা ছাড়া, পার্লামেন্ট আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্ট ছাড়া অন্য যে-কোনো আদালতকে নিজ এক্তিয়ারের মধ্যে পূর্বোক্ত লেখসমূহ জারি করতে ক্ষমতা প্রদান করতে পারে। তবে আজ পর্যন্ত পার্লামেন্ট এই ধরনের কোনো আইন প্রণয়ন করেনি।

আদেশ, নির্দেশ বা লেখ ঃ

সংবিধানে উল্লিখিত আদেশ, নির্দেশ বা লেখগুলি হল ১) বন্দি প্রত্যক্ষীকরণ, ২) পরমাদেশ, ৩) প্রতিষেধ, ৪) অধিকার-পৃচ্ছা এবং ৫) উৎপ্রেষণ।

১) 'বন্দি প্রত্যক্ষীকরণ'(Habeas Corpus) কথাটির অর্থ বন্দিকে আদালতে সশরীরে হাজির করা। কোনো ব্যক্তিকে আটক করা হলে কী কারণে তাকে আটক করা হয়েছে, তা জানার জন্য সুপ্রিমকোর্ট বা হাইকোর্ট বন্দির আবেদনক্রমে আটককারীর ওপর আদেশ জারি করে বন্দিকে আদালত কক্ষে উপস্থিত করার নির্দেশ দিতে পারে। আদালত যদি মনে করে যে, বেআইনিভাবে আবেদনকারীকে আটক করা হয়েছে, তবে আটক ব্যক্তির মুক্তিদানের নির্দেশ দিতে পারে।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সুপ্রিমকোর্ট কেবল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ‘বন্দি প্রত্যক্ষীকরণ’ লেখ জারি করতে পারে। কিন্তু হাইকোর্ট রাষ্ট্র এবং ব্যক্তি উভয়ের বিরুদ্ধেই এই লেখ জারি করার অধিকারী। তবে দুটি ক্ষেত্রে সুপ্রিমকোর্ট বা হাইকোর্ট ‘বন্দি প্রত্যক্ষীকরণ’ লেখ জারী করতে পারে না, যথা - ক) নিজ এক্তিয়ারের বাইরে কোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হলে আদালত এরূপ লেখ জারি করতে অক্ষম এবং খ) ফৌজদারি অপরাধের জন্য কোনো আদালত কর্তৃক হাজতবাসের দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির মুক্তির উদ্দেশ্যে সুপ্রিমকোর্ট বা হাইকোর্ট ‘বন্দি প্রত্যক্ষীকরণ’ লেখ জারি করার অধিকারী নয়।

২) ‘পরমাদেশ’ (Mandamus) শব্দটির অর্থ ‘আমরা আদেশ দিচ্ছি’ (We order) সুপ্রিমকোর্ট বা হাইকোর্ট কোনো অধস্তন আদালত, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে নিজ দায়িত্ব পালনের জন্য পরমাদেশ জারি করতে পারে। এই আদেশ জারি করে আদালত সরকারকে আইনসঙ্গত ও জনস্বার্থ সম্পর্কিত কর্তব্য সম্পাদনে বাধ্য করে। কিন্তু ভারতের রাষ্ট্রপতি কিংবা কোনো রাজ্যের রাজ্যপালের বিরুদ্ধে পরমাদেশ জারি করার ক্ষমতা সুপ্রিমকোর্ট বা হাইকোর্টের নেই।

৩) ‘প্রতিষেধ’ (Prohibition) কথাটির অর্থ ‘নিষেধ করা’। এই আদেশ জারি করে উর্দ্ধতন আদালত নিম্নতন আদালতকে তার এক্তিয়ার বহির্ভূত কার্য-সম্পাদমনে বাধা দিতে পারে। ঊর্দ্ধতন আদালতের এই নির্দেশ লঙ্ঘন করা হলে লঙ্ঘনকারীকে আদালত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত করা যেতে পারে।

৪) ‘অধিকার পৃচ্ছা’ (Quo-warranto)-র অর্থ ‘কোন অধিকারে’। কোনো ব্যক্তি যে-পদ অধিকার করে থাকে সেই পদের জন্য তার দাবি কতখানি যুক্তিসঙ্গত, তা সুপ্রিমকোর্ট বা হাইকোর্ট অধিকার পৃচ্ছার মাধ্যমে খতিয়ে দেখে। দাবিটি অবৈধ বলে মনে করলে আদালত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পদচ্যুত করার নির্দেশ দিতে পারে।

৫) ‘উৎপ্রেষণ’(Certiorari) বলতে ‘বিশেষভাবে জ্ঞাত হওয়া’ বোঝায়। সুপ্রিমকোর্ট বা হাইকোর্ট কোনো মামলার নিরপেক্ষ বিচার করার জন্য কিংবা অধস্তন আদালতগুলির ক্ষমতা-বর্হিভূত কার্যে বাধাদানের উদ্দেশ্যে তাদের এই নির্দেশ দিতে পারে যে, মামলাটি শুনানির জন্য উচ্চ আদালতে প্রেরণ করা হোক। এরূপ আদেশ পৌর প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হতে পারে।

ব্যতিক্রম ঃ সংবিধানের অন্যান্য মৌলিক অধিকারের মতো সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকারটিও অবাধ ও নিরঙ্কুশ নয়। এই অধিকারের ব্যতিক্রমগুলি হল -

ক) যুদ্ধ কিংবা বহিরাক্রমণের ফলে সমগ্র দেশ বা তার কোনো অংশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। এরূপ জরুরি অবস্থা ঘোষিত হলে সংবিধানের ১৯ নং ধারায় বর্ণিত স্বাধীনতার অধিকারগুলি অকার্যকর হয়ে যায়। এমতাবস্থায় আইনসভা যে-কোন আইন প্রণয়ন করতে এবং শাসন-বিভাগ যে-কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে [৩৫৮(১) নং ধারা]।

খ) তা ছাড়া, জরুরি অবস্থার সময় রাষ্ট্রপতি আদেশ(Order) জারি করে কেবল ২০ ও ২১ নং ধারায় বর্ণিত অধিকারগুলি ছাড়া অন্যান্য মৌলিক অধিকারকে কার্যকর করার জন্য আদালতে আবেদন করার অধিকার স্থগিত রাখতে পারেন[৩৫৯ (১) নং ধারা]

গ) সশস্ত্র বাহিনীর অথবা জনশৃঙ্খলা রক্ষায় নিযুক্ত অন্যান্য বাহিনীর কিংবা গোয়েন্দা ব্যুরো বা এই ধরনের অন্য সংগঠনের প্রয়োজনে নিযুক্ত টেলি-যোগাযোগ ব্যবস্থার কর্মীদের কর্তব্য সম্পাদন ও শৃঙ্খলা রক্ষা সুনিশ্চিত করার জন্য তারা কতখানি মৌলিক অধিকার ভোগ করতে পারবে, পার্লামেন্ট আইন প্রণয়নের মাধ্যমে তা স্থির করে দিতে পারে [৩৩(ক)-(খ) নং ধারা]।

ঘ) ভারতের কোনো অঞ্চলে সামরিক শাসন চালু থাকাকালীন কোনো সামরিক কর্মচারী বা অন্য কেউ শৃঙ্খলা রক্ষা বা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য কোনো অবৈধ কাজ করলে পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করে ওইসব কাজকে বৈধ বলে ঘোষণা করতে পারে।[৩৪ নং ধারা]। পার্লামেন্ট-প্রণীত এরূপ আইনকে ‘দণ্ডনিষ্কৃতি আইন’ (Indemnity Act) বলা হয়।

মৌলিক অধিকারগুলিক কি নিরঙ্কুশ ?

সাধারণ অবস্থায় আরোপিত বাধানিষেধ ঃ ভারতীয় সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলির ওপর রাষ্ট্র আইন প্রণয়নের মাধ্যমে কতকগুলি যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে। এগুলি হল ১) রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা রক্ষা, ২) বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধন স্থাপন, ৩) জনশৃঙ্খলা রক্ষা, ৪) আদালত অবমাননা রোধ, ৫) মানহানি প্রতিরোধ, ৬) অপরাধ অনুষ্ঠান বা অপরাধমূলক কার্যে প্ররোচনা দান বন্ধ এবং ৭) অশালীনতা ও অসদাচার প্রতিরোধ প্রভৃতি।

বিশেষ অবস্থায় আরোপিত প্রতিরোধ ঃ আবার, বিশেষ অবস্থায় রাষ্ট্র মৌলিক অধিকারগুলির ওপর যে সকল বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে, সেগুলি হল ঃ ১) সশস্ত্র বাহিনী অথবা সাধারণ শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ভারপ্রাপ্ত বাহিনীর লোকেদের ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকারসমূহের প্রয়োগ সম্পর্কিত নিয়মাবলী সংশোধন করার ক্ষমতা পার্লামেন্টের আছে। অবশ্য ওই সকল ব্যক্তির কর্তব্যনিষ্ঠা ও নিয়মানুবর্তিতার প্রয়োজনেই কেবল পার্লামেন্ট অধিকারগুলি পরিবর্তন করতে পারে। ২) দেশে যদি সামরিক আইন বলবৎ থাকে, তবে দেশের শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য কেন্দ্র অথবা রাজ্যের যে-কোন কর্মচারীকে বরখাস্ত করার ক্ষমতা পার্লামেন্টের আছে। ৩) রাষ্ট্রপতি দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করলে পার্লামেন্ট দেশের সামগ্রিক প্রয়োজনে যে-কোন আইন প্রণয়ন করতে পারে। মৌলিক অধিকার সমূহের বিরোধী বলে আদালত এই আইনকে বাতিল করতে পারে না। ফলে, জরুরি আবস্থায় নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহ কার্যত ভিত্তিহীন হয়ে পড়ে।

৪) ২৫-তম সংবিধান সংশোধনী আইনের মাধ্যমে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, ৩৯ (খ) ও (গ) নং ধারায় বর্ণিত নির্দেশমূলক নীতিগুলিকে কার্যকর করতে গিয়ে পার্লামেন্ট-প্রণীত কোনো আইন সংবিধানের ১৪, ১৯ ও ৩১ নং ধারার বিরোধী হলেও তা বাতিল হবে না। ১৯৮০ সালে মিনার্ভা মিলস মামলায় ৪২-তম সংবিধান সংশোধনী আইনের ৪ ও ৫৫ নং অনুচ্ছেদ দুটিকে সুপ্রিমকোর্ট বাতিল করে দিলেও ২৫-তম সংবিধান সংশোধনী আইনের পূর্বোক্ত অংশটি অপরিবর্তিত থেকে যায়। এর অর্থ পূর্বোক্ত ধারায় বর্ণিত নির্দেশমূলক নীতিগুলি মৌলিক অধিকারের ওপর স্থান পেয়েছে।

উপসংহার ঃ ধারতীয় সংবিধানে মৌলিক অধিকারগুলির ওপর এত বেশি নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার জন্য অনেকে জনগণের মৌলিক অধিকারের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তাঁরা মনে করেন যে,

১) ভারতীয় সংবিধান একহাতে অধিকারগুলি প্রদান করে অন্য হাতে সেগুলি হরণ করেছে।

২) তা ছাড়া, মৌলিক অধিকারসমূহের মধ্যে অর্থনৈতিক অধিকার স্বীকৃত না হওয়ার ফলে সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলি মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। তাই সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক অধিকার তৃতীয় অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করে ভারতীয় গণতন্ত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় করা একান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় ভারতীয় গণতন্ত্র তত্ত্বসর্বস্ব নীতিকথার ঊর্ধ্বে কোনোদিন নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না।

ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্যসমূহ (Fundamental Duties of Indian Citizens) ঃ

১৯৭৬ সালের ৪২-তম সংবিধান সংশোধনের ফলে সংবিধানের চতুর্থ অংশের সঙ্গে ৪-ক (IV-A) নামক একটি নতুন অংশ (Part) সংযোজন করা হয়। এই অংশের ৫১-ক নং ধারায় ভারতীয় নাগরিকদের ১০টি মৌলিক কর্তব্য পালনের কথা বলা হয়েছিল। এর পর ২০০2 সালে ৮৬-তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে ৫১-ক ধারাটির মধ্যে একটি নতুন মৌলিক কর্তব্য সংযোজিত হয়েছে। এর ফলে বর্তমানে ভারতীয় নাগরিকদের পালনীয় মৌলিক কর্তব্যের সংখ্যা ১০ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১১ তে দাঁড়িয়েছে।

এগুলি হল ঃ

১) সংবিধান মান্য করা এবং সাংবিধানিক আদর্শ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় স্তোত্র (National Anthem)-এর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন;

২) স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুপ্রেরণাদানকারী সুমহান আদর্শগুলির সযত্ন সংরক্ষণ ও অনুসরণ;

৩) ভারতের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য ও সংহতিকে সমর্থন ও সংরক্ষণ;

৪) দেশরক্ষা ও জাতীয় সেবামূলক কার্যের আবেদনে সাড়া দেওয়া;

৫) ধর্মগত, ভাষাগত ও আঞ্চলিক বা শ্রেণীগত ভিন্নতার ঊর্দ্ধে উঠে ভারতীয় জনগণের ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের বিকাশ এবং নারীর মর্যাদাহানিকর প্রথাসমূহ বর্জন;

৬) জাতীয় মিশ্র সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্যকে মূল্যদান ও সংরক্ষণ;

৭) বনভূমি, হ্রদ, নদনদী এবং বন্যপ্রাণী-সহ প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং জীবিত প্রাণীসমূহের প্রতি মমত্ববোধ প্রদর্শন;

৮) বৈজ্ঞানিক মানসিকতা, মানবিকতা, অনুসন্ধিৎসা ও সংস্কারমূখী দৃষ্টভঙ্গির প্রসার সাধন;

৯) সরকারি সম্পত্তির সংরক্ষণ ও হিংসা বর্জন;

১০) সর্বপ্রকার ব্যক্তিগত ও যৌথ কর্মপ্রচেষ্টাকে উন্নতর পর্যায়ে উন্নীত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকার কার্যকলাপের উৎকর্ষসাধন;

১১) প্রত্যেক পিতামাতা বা অভিভাবক কর্তৃক তাঁর ৬-১৪ বছর বয়স্ক শিশুর শিক্ষাদানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ।

ভারতীয় নাগরিকদের উপরিউক্ত মৌলিক কর্তব্যগুলিকে মৌলিক অধিকারের সঙ্গে যুক্ত করার পরিবর্তে সংবিধানের চতুর্থ অংশে বর্ণিত রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে। ফলে, এগুলিকে অমান্য করা হলে আদালতে প্রতিকার পাওয়া যায় না। কারণ, সংবিধানের চতুর্থ অংশে বর্ণিত নির্দেশমূলক নীতিগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য নয়। তাই এইসকল কর্তব্যকে সদিচ্ছার প্রকাশ বলে চিহ্নিত করা যায়।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ